১ এপ্রিল, ২০১৬

দক্ষিণ কলকাতায় কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সুবিশাল মিছিল

পরিস্থিতির পরিবর্তন করতেই হবে

১ এপ্রিল ২০১৬। রাজ্য সরকারী কর্মচারী, বোর্ড-কর্পোরেশন-পঞ্চায়েত কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথমঞ্চের আহ্বানে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। মধ্য কলকাতার ধর্মতলা থেকে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্ক ছিল মিছিলের নির্ধারিত রুট। যে দিন মিছিল হওয়ার কথা, তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই যৌথ মঞ্চের শরিক প্রতিটি সংগঠন প্রচার-প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। কিন্তু মিছিলের ঠিক আগের দিন (৩১ মার্চ) উত্তর কলকাতায় একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। বিবেকানন্দ রোডে ভেঙ্গে পড়ে নির্মীয়মাণ পোস্তা ব্রিজের একাংশ। হতাহত হন বহু মানুষ। স্বভাবতই শোকের আবহ তৈরি হয় শহর জুড়ে। নির্মাণগত ত্রুটির প্রশ্নটি সামনে আসতেই, শাসক দলের একাংশের সন্দেহজনক ভূমিকার বিষয়টিও জনসমক্ষে চলে আসে। ফলে শোক ছাপিয়ে তৈরি হয় বিপুল ক্ষোভও। এই পরিস্থিতিতে মিছিল করা সঙ্গত হবে কিনা, তা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল আয়োজক সংগঠনগুলির মধ্যেই। ফলে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এটাই ছিল আয়োজক সংগঠনগুলির যৌথ বোঝাপড়া। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই দেখা গেল স্রোতের মতো কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা নিজ-নিজ সংগঠনের ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন ধর্মতলায়। সাড়ে পাঁচটা বাজার আগেই রানী রাসমনি এভিনিউর তিনটি লেনই তখন কানায় কানায় পূর্ণ। সমস্ত যানবাহন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে ট্র্যাফিক পুলিশ। স্লোগানে, স্লোগানে সুসজ্জিত তিনটি ট্যাবলোও হাজির সঠিক সময়েই। মিছিলে হাজির এমন বেশ কয়েকজনকে আগের দিনের দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'যা কিছু অনিষ্ট এই রাজ্যে ঘটছে, সব কিছুর পিছনেই কোনো না কোনোভাবে রাজ্যের শাসকদল জড়িত। ফলে শুধু শোকপ্রকাশ করলে সমস্যার সমাধান হবে না। রাজ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন ব্যতীত ভালোভাবে বাঁচার আর কোনো পথ নেই। তাই নেতাদের বলেছি বুকে ক্ষোভ নিয়েও মিছিল করতেই হবে।' এই কয়েকটি কথাই ছিল সমগ্র জমায়েতের কথা। মিছিল শুরু হল যথাসময়ে। একেবারে সামনে একটি ব্যানারে উড়ালপুল দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছিল। ঐ ব্যানারের ঠিক পিছনেই ছিলেন মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলা কর্মচারীরা। তারপরে ছিল মিছিলের মূল ব্যানারটি। যেখানে রাজ্যের দমবন্ধ করা পরিস্থিতি পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। তিনটি সুসজ্জিত ট্যাবলোয় উল্লিখিত ছিল মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন সহ জরুরী পাঁচ দফা দাবি। কিন্তু সেদিন মিছিলে উপস্থিত কয়েক হাজার কর্মচারীর দৃপ্ত মিছিল সব স্লোগান ছেড়ে যেন একটা স্লোগানকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছিল—স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত বর্তমান সরকার আর নেই দরকার। কেন? মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই একজন জবাব দিলেন, 'এই সরকার না গেলে, আমাদের কোনো দাবিই মিটবে না। তাই সরকারটাকেই পাল্টে ফেলা দরকার। সেই কথাই জনগণকে জোর দিয়ে বলছি। একটা উৎসাহব্যঞ্জক দৃশ্যও পরিলক্ষিত হল। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষও স্লোগানে গলা মেলাচ্ছিলেন, মিছিলকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এতে একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছিল—সব অংশের মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা এক বিন্দুতে এসে মিলছে। কত কর্মচারী ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন মিছিলে? বলা সম্ভব নয়। মাথা গোনা যায় নি। কিন্তু একটা আন্দাজ পাওয়া যায় মিছিলের দৈর্ঘ্য থেকে। মিছিলের সামনের অংশ যখন পার্কস্ট্রিট মোড়ে, তখনও শেষ অংশ ধর্মতলা ছাড়েনি। মনোজকান্তি গুহ, অসিত ভট্টাচার্য, অশোক পাত্র, বিজয় শংকর সিন্‌হা, বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, উৎপল রায়, সমর চক্রবর্তী, কপিল কাপাসি, নীল কমল সাহা, মলয় মুখার্জি, সন্দীপ দাশগুপ্ত প্রমুখ যৌথ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। □

যষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

২৮ এপ্রিল, বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ'র নেতৃত্বে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল লবনহ্রদের বিকাশ ভবনে অবস্থিত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে বেতন কমিশন সংক্রান্ত স্মারকলিপি প্রদান করেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টাচার্য, দুই সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা ও বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শিখা মুখার্জী, সংগঠনের লবনহ্রদ অঞ্চল কমিটির সম্পাদক পিনাকি সেনগুপ্ত, যুগ্ম-সম্পাদক অভিজিৎ দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

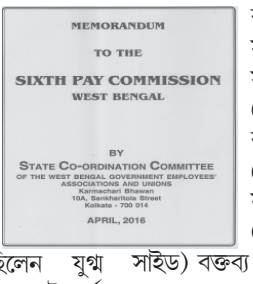

MEMORANDUM

TO THE

SIXTH PAY COMMISSION

WEST BENGAL

BY

STATE CO-ORDINATION COMMITTEE

OF THE WEST BENGAL GOVERNMENT EMPLOYEES' ASSOCIATIONS AND UNIONS

Karmachari Bhawan

10A, Sankharitola Street

Kolkata - 700 014

APRIL, 2016

এই স্মারকলিপিতে রাজ্য কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের প্রশ্নে সংগঠনের বক্তব্য নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেহেতু কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, তাই সংগঠন কেন্দ্রীয় কর্মচারী সংগঠনগুলির (জেসিএম-স্টাফ সাইড) বক্তব্য কেই অনুসরণ করে ন্যূনতম বেতন, বিভিন্ন ভাতা, পেনশন ও পেনশন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বক্তব্য নির্ধারণ করেছে। এর ভিত্তিতেই অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলি তাদের ক্যাডার/দপ্তর ভিত্তিক বক্তব্য পরবর্তী পর্বে বেতন কমিশনকে জানাবে। *স্মারকলিপির সংক্ষিপ্তসার চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।*

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির যৌথ সিদ্ধান্ত

দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ ও ফেডারেশনগুলির যৌথ উদ্যোগে ৩০ মার্চ ২০১৬ নয়া দিল্লীর মভলঙ্কার হলে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশন ঐতিহাসিক ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫-র সফল ধর্মঘট ও ১০ মার্চ ২০১৬ দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস সাফল্যের সাথে পালন করার জন্য দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের অভিনন্দন জানায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী, শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদে আরও বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান ঘোষণা করে।

এই কনভেনশন গভীর উদ্বেগের সাথে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পেশ করা বারো দফা দাবির প্রতি চূড়ান্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করছে। ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ধর্মঘটের ঐতিহাসিক সাফল্যের পরও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চের আলোচনার প্রস্তাবে এই সরকার কোনও আগ্রহই প্রকাশ করছে না।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যক পণ্যের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে শুধু বাগাড়ম্বর করা ছাড়া কোনও সদিচ্ছাই প্রকাশ করছে না। উপরন্তু ডাইরেক্ট বেসিক ট্রান্সফারের নামে বেশি সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে প্রাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। ২০১৬-১৭-র কেন্দ্রীয় বাজেটে উল্লেখিত পেট্রোপণ্যের শুল্ক বৃদ্ধি, কয়লায় সেসের বৃদ্ধি এবং পরোক্ষ করের বৃদ্ধি জনসাধারণকে আরও সঙ্কটের মুখে ফেলেছে।

এই সরকার কালো টাকা উদ্ধারে বা চার লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ এবং প্রায় সমপরিমাণ অনাদায়ী আয়কর উদ্ধারে কোনও চেষ্টাই করেনি, যা ঋণখেলাপি বৃহৎ শিল্পপতিদের আরও উৎসাহিত করেছে। সাথে সাথে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে অর্থ সংস্থান ব্যাপক হারে কমানো হয়েছে। নয়া পেনশন ব্যবস্থার মাধ্যমে দু'হাজার চারের পরে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে অসংখ্য শ্রমিক কর্মচারী বিনা আর্থিক সংস্থানে গালভরা নতুন প্রকল্পের নামে প্রতারিত হচ্ছেন। যদিও কর্মচারী আন্দোলনের চাপে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় আয়কর বসানোর প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়েছে কিন্তু স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে সুদের হার বহুল পরিমাণে হ্রাসের ফলে অবসর প্রাপ্ত এবং প্রান্তিক জনসাধারণ প্রচণ্ডভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

এই সরকার দেশের প্রচণ্ড শ্রমিক বিক্ষোভকে অগ্রাহ্য করে যেভাবে শ্রম আইন সংশোধনে রাজস্থানি মডেলে ন'টি মুখ্য শ্রম আইনকে নতুন উদ্যোগপতিদের জন্য রেহাই

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

৪৫তম গ্রাহক বর্ষের শুরুতে

আমি সংগ্রামী হাতিয়ার বলছি

প্রিয় বন্ধু,

শুরুতেই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। 'শুভেচ্ছা বার্তা' যদি আন্তরিক হয়, তাহলে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সকলের জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আমার সাথে আপনার এবং লক্ষাধিক পাঠক বন্ধুর সম্পর্ক এতটাই গভীর যে 'শুভেচ্ছা বার্তা'-তে সেই সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নই লুকিয়ে রয়েছে। তবে সে প্রসঙ্গে পরে আসব। আগে একটু নিজের কথা বলি।

আমি এবার পঁয়তাল্লিশ-এ পা দিলাম। মানুষের জীবন পর্ব যেভাবে ভাগ করা হয়, তাতে পঁয়তাল্লিশ মানে যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের পথে। কিন্তু আমার জীবনে তেমন কোনো স্তরভাগ নেই। জন্মলগ্ন থেকেই আমাকে পরিণত বয়সের মনস্কতা নিয়ে পথ চলতে হয়েছে। দায়িত্বটাও বুঝে নিতে হয়েছে শুরুতেই। আপনাদের ছোটবেলার মতো হেসে-খেলে বেড়াবার কোনো সময় ও সুযোগ আমার ছিল না। মানব শিশু বড় হবার সময় যেমন সামনে অনেকগুলো পথ খোলা থাকে, আমার সামনে তেমন কোনো অপশনও ছিল না। আমাকে কি কি করতে হবে, তা ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই আমার অভিভাবক সংগঠন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে, বুঝিয়ে দিয়েছে। সে কথাগুলো এই ৪৪ বছর ধরে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি। আজ আমার খুব ইচ্ছে করছে সেই কথাগুলো আপনাদের জানাতে। একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন তো?

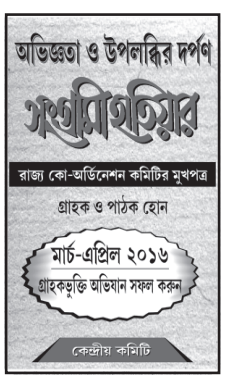

প্রথমত, আমাকে যা বলা হয়েছে, এবং আমি যা কায়মনবাক্যে বিশ্বাস করি, তা হল আমার জীবনশক্তি নিহিত রয়েছে আপনাদের সাথে নৈকট্য, সখ্যতা ও প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মধ্যে। এগুলিই আমার প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনারালস্... সব কিছুই। এগুলি প্রচুর প্রচুর পরিমাণে আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি বলেই, আজ পঁয়তাল্লিশ-এও আমার জীবনশক্তি ভরপুর। শ্রান্ত-অবসন্ন হবার কোনো চিহ্নই আমার শরীরে নেই।

দ্বিতীয়ত, আপনার সাথে, আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব, সখ্যতা, মিত্রতা— যাই বলি না কেন, তা যদি রক্ষা করতেই হয়, এবং করতেই হবে, কারণ এগুলি তো আমার জীবনশক্তি, তাহলে আমারও কিছু ভূমিকা পালন করা দরকার। কি সেটা? আমার সংগঠন আমাকে শিখিয়েছে, যে প্রশাসনের মধ্যে আপনারা কাজ করেন তার চেহারাটা কেমন তা আপনাদের বলা প্রয়োজন। যদিও আপনাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রশাসনের চেহারা, প্রশাসনিক আধিকারিকদের পরিচালন-পদ্ধতি, জনপ্রতিনিধি হিসেবে যে রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতাসীন হয়, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মসূচীর চরিত্র প্রভৃতি সবটাই ধরা পড়ে, তবুও আমাকেও এই বিষয়গুলি নিয়ে কিছু কথা বলতেই হয়, কারণ একজন ব্যক্তি কর্মচারী তাঁর পারিপার্শ্বিক সীমিত গণ্ডীর মধ্যে থেকে প্রশাসনকে দেখার সুযোগ পান, কিংবা বোঝার চেষ্টা করেন। আমার সুবিধা হলো, আমি উল্লম্ব এবং আনুভূমিক, উভয় দিকেই প্রশাসনের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আমার প্রিয় সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে দ্রুত বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি এবং তা আপনাদের কাছে পরিবেশন করতে পারি। এর মধ্য দিয়ে আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানার পরিধিটা আরও বিস্তৃত হয়।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার

এপ্রিল ২০১৬

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

৪৪তম বর্ষ □ দ্বাদশ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই

স্বাগত ১৪২৩। বাংলার নতুন বছর। যদিও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক দিক থেকে এই নতুন বছরের খুব বেশি কার্যকারিতা নেই। কিন্তু বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে নতুন করে একাত্মবোধ করার একটা তাগিদ যেন অনুভূত হয় এই নতুন বছরের আগমনের মধ্য দিয়ে। এই অনুভূতিটা চাগাড় দিয়ে ওঠে আরও বেশি, যেহেতু নতুন বছরের পিছু পিছুই আসে রবি ঠাকুরের জন্মদিন। তাই নববর্ষের বোধন আর 'কবি প্রণাম' মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় বাংলা সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে। তবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, নব্য ভিনদেশী সংস্কৃতির দাপটে আমরা এখন এতটাই ন্যুব্জ যে বর্ষবরণ বা কবি প্রণাম সবটাই যেন রিচ্যুয়াল বা আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বছরের এমন দু-একটি নির্দিষ্ট দিনে নিজস্ব-সংস্কৃতির ঘরানা ও স্বকীয়তা বজায় রেখে বাকি সময়গুলো কেমন যেন বর্তমান সময়ের প্রাধান্য বিস্তারকারী সংস্কৃতিকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ব কবি বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, নিজস্ব সংস্কৃতি বা কালচারকে ('কালচার' অর্থে জীবনচর্যা। শুধু গান, কবিতা বা নাটক নয়) ভিন্নধর্মী কালচারের ছাঁচে ঢেলে, সেই মতো গড়ে নেবার অন্ধ ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে অপরাপর সংস্কৃতির ছোঁয়া বাঁচানোর জন্য দরজা-জানালার কপাটগুলোকে সব বন্ধ করে রাখতে হবে। এমনটা হলে, স্রোতস্বিনী সংস্কৃতি কালের প্রবাহে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয় এবং সেখানে জন্ম নেয় বিভিন্ন পশ্চাদমুখী ভাবনার আগাছা ও কীটপতঙ্গ। বর্তমান সময়ে এই প্রচেষ্টাও ভালোরকম শুরু হয়েছে।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সংস্কৃতি সম্পর্কে এতগুলি কথা বলার কারণই হল, এর অন্যতম উপাদান হল 'মূল্যবোধ', যা সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলে। আজ, নতুন বছরের শুরুতে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালে বোঝা যায়, আমাদের 'মূল্যবোধ' বিভিন্ন দিক থেকে ভীষণভাবে আক্রান্ত। ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের বুনিয়াদগুলিকে ধ্বংস করার জন্য যতরকম অস্ত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে, তার সবগুলিকে ধরে ধরে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করার পরিসর এখানে নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে যে বিষয়টিকে কোনোভাবেই নজর আন্দাজ করা উচিত হবে না, তা হল মূল্যবোধকে নষ্ট করার পরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্যোগ। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই বাংলায় আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি এবং সাম্প্রতিক সময়ে যার আরও ঘনীভূত রূপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা জানি, বাংলার (অবিভক্ত) রাজনৈতিক সংস্কৃতির উৎসমুখ ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। ঐ নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত রাজনীতি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হলেও, এবং সেই ধারাগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে বিস্তর ফারাক থাকলেও, ন্যূনতম কিছু মূল্যবোধ সকল ধারাতেই উপস্থিত ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর খণ্ডিত বাংলাতেও তার অন্যথা হয়নি। কি ছিল মূল্যবোধের সেই ন্যূনতম মাপকাঠিগুলি?

প্রথমত, রাজনীতি আবর্তিত হত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ঘিরেই। তাঁরা সকলেই আদর্শস্থানীয় ছিলেন, তাঁদের কোনো দোষ-ত্রুটি ছিল না, এমন নয়। ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিন্তু সকলেই ছিলেন সক্রিয় রাজনীতির লোক। তাদের মধ্য থেকেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন। কিন্তু এখন? চিত্র তারকা, ক্রীড়াবিদ প্রমুখ অনেকেই যাঁদের সক্রিয় রাজনীতি বা জনসাধারণ কেন্দ্রীক কোনো কর্মসূচীতেই কোনোদিন কোনো ভূমিকা ছিল না, তাঁদের জনপ্রতিনিধি করে পাঠানো হচ্ছে। আচ্ছা, কি বলবেন তাঁরা লোকসভা বা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে? সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিবহাল তাঁরা? শুধুমাত্র নির্বাচনী বৈতরণী পার করার জন্য ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে জনপ্রিয়তা তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অতীতেও রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কে একের প্রতি অপর পক্ষের তীব্র সমালোচনা, শ্লেষ, ব্যাঙ্গাত্মক বা তির্যক মন্তব্য এসব কিছুই ছিল। এমনকি নীতির বাইরে গিয়ে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যক্তিগত কুৎসাও যে একেবারে হত না তা নয়। তবু সব কিছুর মধ্যেও শালীনতার ন্যূনতম মাপকাঠি ছিল। ঐ সীমারেখাটি সব পন্থীরাই মেনে চলতেন। কিন্তু এখন একাংশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করছেন তা অতীতে অকল্পনীয় ছিল। এ ভাষা রাজনীতি বর্জিত তো বটেই, এমনকি 'রকের ভাষা'-র শিরোপা পাওয়ারও যোগ্য নয়। রাজনৈতিক ভাষ্য ও অপরাধ জগতের ভাষার কার্যত কোনো পার্থক্য থাকছে না।

তৃতীয়, দুর্নীতি। এটা ঠিকই যে বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় স্তরে বা বিভিন্ন রাজ্যে রাজনীতির সাথে দুর্নীতি আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু এ প্রশ্নে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ ছিল উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। অথচ গত কয়েক বছরে এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি কার্যত গ্রাস করে ফেলেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অন্যান্য রাজ্য আমাদের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখত, আজ আমরা লজ্জায় অন্যদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছি না।

সব মিলিয়ে সুপরিকল্পিত এই চক্রান্তের লক্ষ্য অনেক গভীরে। দুর্নীতি ও অশালীন ভাষা সম্বলিত 'রাজনীতি' বর্জিত রাজনীতিকেই মানুষের গা সওয়া করে ফেলানোর চেষ্টা হচ্ছে, যাতে মূল্যবোধটাই নষ্ট হয়ে যায়। এর সাথে গণতন্ত্রের বিপন্নতারও একটা সম্পর্ক রয়েছে, কারণ, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ নামলে, মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে চায়। আর ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর মানসিক শক্তির উৎস মূল্যবোধ। তাই মূল্যবোধ নষ্ট করে দিতে পারলে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইটাও দুর্বল হয়। স্বভাবতই এই মুহূর্তে রাজ্য জুড়ে যে লড়াইটা খেটে খাওয়া মানুষ, শান্তিপ্রিয় মানুষ লড়ছেন, তা গণতন্ত্রের সাথে সাথে মূল্যবোধকে রক্ষা করারও লড়াই। ফলে এই লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে আনতেই হবে। নববর্ষের অঙ্গীকার হোক এটাই। □

২৮ এপ্রিল, ২০১৬

টেন কমান্ডমেন্টস

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

সকলেই আমার আন্তরিক ভালোবাসা গ্রহণ করিও। বয়স নির্বিশেষে সকল রাজ্যবাসীকেই ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলাম দেখিয়া চমকিত হইও না। বয়োজ্যেষ্ঠ গণকেও বলিব, তোমরাও ক্ষুব্ধ হইও না। আমি যেহেতু ইতোমধ্যেই সর্বজনীন দিদি'র শিরোপা লাভ করিয়াছি, সুতরাং সকলকেই ভ্রাতা ও ভগিনী বলিবার হক আমর রহিয়াছে। ইহা লইয়া নিন্দুকেরা সরব হইলে তোমরাই প্রতিবাদ করিও।

এক্ষণে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতে চাহি তাহা নীতিমাল্য রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আমার 'সদুপদেশ' অনুসরণ করিলে জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে তাহা জানিও। তোমাদের নিশ্চিত স্মরণে রহিয়াছে কিয়ৎ বৎসর পূর্বে আমার হিতোপদেশ সম্বলিত কথাঞ্জলি প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা 'হটকেক'-এর ন্যায় স্বল্পদিনেই বাজার হইতে নিঃশেষিত হইয়াছিল। স্বভাবতই পুনর্মুদ্রণের আবদার আমার পারিষদগণ করিতেছিলেন। কিন্তু আমি সময় সংকুলান করিতে পারিতেছিলাম না। কারণ আমার বহুমুখীন সাংস্কৃতিক প্রতিভা থাকিলেও, সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক চর্চা একযোগে করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে থাকে না। আমি যখন চিত্রকর তখন গায়ক নহি, যখন গায়ক তখন লেখক নহি, যখন লেখক তখন চিত্রকর নহি ইত্যাদি। ফলত আমার বহুবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিভা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বিচ্ছুরিত হয়। স্বভাবতই 'কথাঞ্জলি'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হইল।

কথাঞ্জলির পরিবর্তে পুস্তকটির নাম নীতিমাল্য রাখিবার কারণই হইল, 'কথাঞ্জলি' বলিলে স্পষ্ট অর্থ পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু 'নীতিমাল্য' নামাকরণ করিলে স্পষ্টতই আমার মনোবাসনা অনুধাবন করা সম্ভব হইবে। যাহা হউক এক্ষণে মূল বিষয়ে ফিরিয়া আসি। নীতিমাল্য রূপে আমি যাহা বলিতে চাহি তাহা হইল,

(১) পরিমাপ পদ্ধতির একক রূপে শুধুমাত্র 'ইঞ্চি' গ্রহণযোগ্য। যাহা কিছু পরিমাপযোগ্য তাহা সকলই পরিমাপ করিতে হইবে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে। এমনকি পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্বও আলোকবর্ষের পরিবর্তে ইঞ্চিতে পরিমাপ করিতে হইবে।

(২) গণতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য হইল 'জনগণ ভ্যানিশ'। গণতন্ত্রে এ যাবৎকাল জনগণকে যেমত গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণত ভুল। জনগণ ভ্যানিশ হইলেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে।

(৩) সর্বাধিক স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য হইলো গুড় ও বাতাসা। সুস্বাস্থের স্বার্থে গুড় ও বাতাসা খাইতেই হইবে।

(৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি নিহিত রহিয়াছে 'সিন্ডিকেট' ব্যবস্থায়। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা প্রভৃতির পরিবর্তে শুধুই সিন্ডিকেট। আদর্শ অর্থনীতির চিত্রটা হইবে এইরূপ—মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অংশ শূন্য শতাংশ, শিল্প শূন্য শতাংশ, পরিষেবা শূন্য শতাংশ, সিন্ডিকেট ১০০ শতাংশ।

(৫) আদর্শ দেশপ্রেমের কাজ হইল তোলাবাজি। যুব সমাজকে জাগরুক করিতে হইলে তোলাবাজিতে যুক্ত করিতেই হইবে।

(৬) প্রত্যেক মানুষের জীবন একমাত্র লক্ষ্য হইবে, উৎকোচ প্রদান ও গ্রহণ। 'পাঁচলাখি উৎকোচ' আদর্শ উৎকোচ রূপে স্বীকৃত হইবে।

(৭) যে কোনো সড়ক বা মহা সড়কের নামাকরণ করিতে হইলে কদাপি সরণী কথাটি ব্যবহৃত হইবে না। ধরণী, মরনি, করনি, খাইনি প্রভৃতি যাহা খুশি হইতে পারে, কিন্তু কদাপি সরণী নহে।

(৮) আগামী দিনগুলিতে পূজা-পার্বনে ঢাক বাজাইতে হইলে অবশ্যই তাহার শব্দ হইতে হইবে চড়াম্-চড়াম্। অন্য কোনো রূপ শব্দ অনুমোদিত হইবে না।

(৯) আগামী শারদোৎসবে মণ্ডপে মণ্ডপে মহিষাসুরকে অবশ্যই 'অক্সিজেন মাস্ক' পরিধান করাইতে হইবে। নৌকা বা গজের পরিবর্তে মা দুর্গা আসিবেন বাইকবাহিনী পরিবৃত হইয়া।

(১০) ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য কখনোই মৌলিক থিসিস চলিবে না। একে অপরের থিসিস নকল করিবেন। ইহা হইলেই গবেষণা কার্য অগ্রগতি ঘটিবে।

এই দশটি নীতিমাল্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন তাঁহারা 'হতশ্রী' পুরস্কারে ভূষিত হইবেন। এক্ষণে তোমরা মোজেসের টেন কমান্ডমেন্টসের পরিবর্তে আমার টেন কমান্ডমেন্টস আত্মস্থ করিও। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেই।

ইতি— কেষ্ট-সহোদরা □

১৫ বৈশাখ, ১৪২৩

শোক সংবাদ

কমরেড কান্তি বিশ্বাস

বাম ও গণ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী কমরেড কান্তি বিশ্বাস ২৭ এপ্রিল রাতে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ জনিত অসুস্থতা নিয়ে ১ এপ্রিল থেকে তিনি ঐ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। কমরেড কান্তি বিশ্বাসের এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পড়াশুনোয় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে স্কুল ও কলেজ জীবন অতিবাহিত করে তিনি অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন নিজ কলেজেই। এই সময়ে তিনি ঐ দেশে সেই সময়ে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলেও তিনি ১৯৬০ সালে ভারতে

(সপ্তম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

আমি সংগ্রামী হাতিয়ার বলছি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমার কাছে আরও একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমার বন্ধুদের, অর্থাৎ আপনাদের বৃত্তিগত দাবি-দাওয়া। আমার অভিভাবক সংগঠন মনে করে কর্মচারীদের আর্থিক ও অন্যান্য দাবি-দাওয়া আদায়ে সচেষ্ট থাকা, অর্জিত দাবি ও অধিকার রক্ষায় সদা তৎপরতা প্রদর্শনই একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মৌলিক কর্তব্য। গত ছয় দশক সময়কালে আমার অভিভাবক সংগঠন এই বিষয়ে অপরিসীম এবং প্রশ্নাতীত যত্নবান থেকেছে। কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস তার সাক্ষী। স্বভাবতই আমার ওপরে সংগঠন কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব হল কয়েকটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান থাকা। যেমন—(১) কোনো এক নির্দিষ্ট সময় ও প্রেক্ষিতে কর্মচারী বন্ধুদের কোন কোন দাবিগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় (যেমন এই মুহূর্তে মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশন), (২) এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী কি, (৩) সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সংগঠন কি কি ভূমিকা পালন করছে, (৪) দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে সরকার যদি অনমনীয় বা উদাসীন মনোভাব গ্রহণ করে (যা এখন প্রায়শই করা হচ্ছে), তখন সরকারের উপর বর্ধিত চাপ সৃষ্টি করার স্বার্থে আন্দোলন-সংগ্রামে কর্মচারীদের অংশগ্রহণ করানোর প্রশ্নে উপযুক্ত প্রচার সংগঠিত করা প্রভৃতি। আমি, আমার ওপর অর্পিত এই দায়িত্বগুলি প্রতিপালনে যে যত্নবান থেকেছি, তার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে, ১৯৭১ সালের মে মাস থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিটি সংখ্যার পাতাগুলিতে। ভবিষ্যতেও এই কাজ আমি করবো। কারণ, সেটা না হলে একটি সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে আমার যে পরিচয়, তার প্রতি সুবিচার করা হবে না।

আবার শুধু আপনাদের অর্থাৎ কর্মচারী বন্ধুদের দাবি-দাওয়া, রাজ্য প্রশাসনের চরিত্র বা সেই প্রশাসনকে যারা পরিচালনা করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়গুলিই আপনাদের জীবন-জীবিকাকে শুধুমাত্র প্রভাবিত করে তা নয়, কারণ রাজ্য সরকারী কর্মচারীর পরিচয়ই আপনাদের একমাত্র পরিচয় নয়, আপনারা পশ্চিমবাংলার অধিবাসী, আপনারা ভারতের নাগরিকও। স্বভাবতই এদেশের অর্থনীতি কেন্দ্রীক বিভিন্ন পরিকল্পনা, তার উত্থান-পতন, তার সুফল-কুফল সবটারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়ে আপনাদের জীবনে। তাই এই প্রসঙ্গগুলিকে এড়িয়ে যাব কী করে? একই কথা প্রযোজ্য সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও। বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বৈচিত্রময় সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত এই সমাজে যদি ধর্মে-ধর্মে বা ভাষা বা জাত-পাতকে ভিত্তি করে অস্থিরতার আগুন জ্বলতে শুরু করে (যা এখন হচ্ছে), তবে তার আঁচ কি আপনার বা আপনাদের গায়ে লাগবে না? তাহলে আমিই বা এই বিষয়গুলি নিয়ে চুপ করে থাকি কি করে? ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝায়, ধর্মাচরণ ও সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য কি, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদের প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করা আমার কাছে তাই জরুরি।

আমার অভিভাবক সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী রাষ্ট্রনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে কোনো প্রশ্নেই কয়েকটি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন গণতন্ত্র, প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা, সততা, স্বচ্ছতা, প্রগতিশীল মূল্যবোধ প্রভৃতি। তাই এগুলির কখনও ব্যত্যয় ঘটলে (যেমন এ রাজ্যে রোজ ঘটছে) তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করাটা আমি পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে করি। আমি পথ চলছিও সেইভাবেই। আপনার এবং আপনাদের সাথে আমার সম্পর্কের বন্ধন এইভাবেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে বলে বিশ্বাস করি।

তবুও শেষ করার আগে মনের মধ্যে জমে থাকা অনুযোগ প্রকাশ না করে পারছি না। অবশ্য সেটাও করছি সম্পর্কের জোরেই। অনুযোগ হল, আপনি যতটা আমার গ্রাহক বন্ধু, ঠিক ততটা পাঠক বন্ধু নন। আমি জানি আপনার সাথে আমার দেখা হওয়ার সুযোগ প্রতি মাসে মাত্র একবার। কিন্তু এই সীমিত সুযোগকে কাজে লাগিয়েই যতটা সম্ভব অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলার চেষ্টা করি। তাতে হয়তো টক-ঝাল-মিষ্টি স্বাদ খুব বেশি থকে না। কি যা থাকে, তা হল, চেতনার স্বাস্থ্যোদ্ধারের পর্যাপ্ত উপাদান।

সবশেষে জানাই আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আপনাদের সকলের জন্য দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা-বিভাজন-শোষণহীন এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আমার সব কথার মধ্যে আমি অস্ফুটে বলি ঐ সোনালি ভবিষ্যতের কথা। আসুন না আমরা সবাই এক সাথে পথ চলি ঐ স্বপ্ন ছোঁয়ার জন্য।

তাই অনুরোধ এবার থেকে গ্রাহকের সাথে সাথে পাঠকও হোন।

বিনীত

সংগ্রামী হাতিয়ার

উদারবাদী অর্থনীতির বিপজ্জনক পথেই তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার

পরমেশ দে

আর এস এস এবং বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণার বহু পূর্বেই দেশী-বিদেশী কর্পোরেট হাউস ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। শুধু তাই নয় এই ইচ্ছা পূরণে বিভিন্ন মিডিয়া প্রচারিত তথ্য অনুযায়ী ১৫ হাজার কোটি টাকার উপর কর্পোরেট হাউস ব্যয় করে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে। আসলে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদীর কার্যকলাপে দেশী-বিদেশী পুঁজির উদ্দাম স্বার্থরক্ষা এবং শ্রমিক নিষ্পেষণে পারদর্শিতা কর্পোরেট পুঁজিকে মোদীর প্রতি আস্থাভাজন করে তোলে। বিগত আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে জাতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারীকরণের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে যে উদারনীতির প্রয়োগ হয়ে চলেছে, মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে তা আরো দ্রুত এবং ব্যাপকতরভাবে কার্যকরী হবে বলেই তারা ঐ আস্থা পোষণ করেন। তাদের আশা যে যথার্থ তা মোদীর এই স্বল্পকালের কার্যকলাপেই প্রমাণিত।

যার বিমানে চেপে মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথম দিন নয়াদিল্লীতে এসেছিলেন, সেই শিল্পপতি গৌতম আদানিই শুধু নয় রিয়ালায়েন্সের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি, টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পালনজি মিস্ত্রি, উইপ্রো গোষ্ঠীর মালিক আজিম প্রেমজিসহ কর্পোরেট হাউসের তাবড় তাবড় রথী-মহারথী সকলেরই নীট সম্পদ বেড়েছে দ্রুতহারে। উপরন্তু তাঁদের করও কমানো হয়েছে লক্ষণীয় হারে; তুলে দেওয়া হয়েছে সম্পদ কর। এ বছরের বাজেটেও কর্পোরেট হাউস ছাড় পাচ্ছে ৬৮,৭১০ (গত আর্থিক বর্ষের তুলনায় ৫.৬ শতাংশ বেশি) কোটি টাকা। স্বাভাবিক কারণে এর ফলে সৃষ্টি ঘাটতির বোঝা চাপানো হল আমজনতার উপর। তেলে-সারে-খাদ্যে ভর্তুকি কমলো। বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। কমছে উৎপাদনে লগ্নির পরিমাণ, কর্মসংস্থান। নির্বাচনী প্রচারে মোদী বলেছিলেন ৫ বছরে ৫ কোটি বেকারের চাকরী হবে। এজন্য ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রকে বাড়ানোর কথাও বলেন, যেখানে বিদেশী কোম্পানিরা ভারতে এসে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট তৈরি করবে—যা বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারও শুরু হল। কিন্তু কোথায় বিদেশী বিনিয়োগ আর কোথায় বা চাকরী! যেটুকু বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে তার সিংহভাগই শেয়ার বাজারে, উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নয়। সরকারী পয়সা ধ্বংস করে সুট-বুট পরে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ করেও প্রধানমন্ত্রী এই হালের কোনো পরিবর্তন করতে পারেন নি। বরং এখানে শিল্পপতিদের উদ্বৃত্ত মুনাফা ইওরোপ, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুরে বিনিয়োগ হয়েছে। আর এই উদ্বৃত্ত মুনাফার পেছনে আছে আমাদের দেশের সস্তা শ্রম বাজার। বেকারী বৃদ্ধির সুযোগে যা প্রতিদিন সস্তা থেকে আরও সস্তা হচ্ছে। লভ্যাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে ক্রমহ্রাসমান মজুরির পরিমাণ। জিডিপির নিরিখে এখন মজুরির অংশ মাত্র ১০ শতাংশ। কৃষিক্ষেত্রের অবস্থাও একইরকম সঙ্কটজনক।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার মারাত্মকভাবে কমে গেছে। তার উপর কৃষিপণ্যের বাজার পুরোটাই ফড়ে-ব্যবসায়ীদের দখলে। সরকারের ভূমিকা যৎসামান্য। ধান-এর ক্ষেত্রে সরকার এবং সমবায় কেনে মাত্র ৬ শতাংশ, গম-এর ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ। বাকিটা ফড়ে-ব্যবসায়ী। শতকরা ৬৮ জন কৃষক ন্যূনতম ক্রয়মূল্যের খবরই রাখেনা। ৯৫ শতাংশ কৃষকের শস্য বিমা নেই। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির আঁচ বাড়লে তার সুফল মেলে ফড়েদের। আর সহায়ক মূল্য বঞ্চিত চাষী ঋণ না মেটাতে পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কর্পোরেট ভজা মোদী অর্থনীতির বিষময় ফল সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে কৃষকদেরও দুর্দশা বাড়িয়ে চলেছে—যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের বৃহৎ অংশ।

নিও লিবারেল বা নয়া উদারবাদী অর্থনীতির এজেন্ডাই হল লগ্নিপুঁজির তোষণ আর তার জন্য জনগণকে কৃচ্ছ্র সাধনে বাধ্য করা। নরেন্দ্র মোদি এই অর্থনৈতিক দর্শনেই দীক্ষিত। ফলে মোদী সরকারের আর্থিক ক্ষেত্রে সমস্ত পদক্ষেপগুলিই সাধারণ মানুষের জীবনে যেমন চরম আর্থিক দুর্যোগ সৃষ্টি করেছে তেমনভাবেই সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম আক্রান্ত হচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব। দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ বেসরকারীকরণ, সরকারী ক্ষেত্রের সঙ্কোচন, সামাজিক কল্যাণখাতে বরাদ্দ ছাঁটাই, বিত্তবানদের কর ছাড়, মানুষের উপর আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি, লগ্নিপুঁজির সুবিধার্থে নানা সুযোগ বৃদ্ধি মোদী জমানায় দ্রুতগতি লাভ করেছে। মোদী সরকারের তিনটি বাজেটেই তার প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

কেন্দ্রীয় সহায়তাভিত্তিক প্রকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে তার পূর্ববর্তী বছরের বাজেটের তুলনায় প্রায় ৪৫.৮ শতাংশ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যেমন আই সি ডি এস, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, সকলের জন্য শিক্ষা ও বাসস্থান প্রকল্পগুলির ছাঁটাই হওয়া অংশ পূরণে রাজ্যগুলি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তাখাতে সরকারী কোষাগারের দায় ঝেড়ে ফেলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজারে সক্রিয় হওয়ার জন্য অর্থের জোগান দেওয়ার কর্পোরেট দাবি পূরণ হবে আর আপামর মানুষ বঞ্চিত হবে সামাজিক সুরক্ষার নানা সুযোগ থেকে। জনকল্যাণমূলক খাতে ২০১৪-১৫ সালে ভরতুকির পরিমাণ ছিল জিডিপি-র ২ শতাংশ ২০১৫-১৬ বর্ষে তা কমে হয়েছে ১.৫ শতাংশ।

জাতীয় অর্থনীতির আর একটি মারাত্মক দিক হচ্ছে কর্পোরেট সেবায় দেশীয় বাজারকে একদম অর্গল মুক্ত করে দেওয়া। কেবলমাত্র লাভজনক ও স্ট্রাটেজিক ক্ষেত্রগুলির বেসরকারীকরণ নয়, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ থেকে ৪৯ শতাংশে নিয়ে যাওয়া, রেল প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মাল্টিব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ৫১ শতাংশ করার দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের আমলের প্রস্তাবকে তখন বিজেপি-র পক্ষ থেকে বিরোধিতা করা হলেও এখন ভোল পাল্টে তারা খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশী লগ্নীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ব্যাঙ্ক, বীমা শিল্পে বিদেশী পুঁজি লগ্নীর পথকে প্রশস্ত করা হয়েছে। এছাড়া দেশী বিদেশী বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যবস্থাকে পরিবর্তন, শ্রম আইনের সংশোধন ঘটানো হচ্ছে। কর ব্যবস্থাতেও তার সঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রত্যক্ষ কর, সম্পদ কর কমিয়ে জনগণের ঘাড়ে চাপছে ক্রমবর্ধমান পরোক্ষ করের বোঝা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমেই জাতীয় ক্ষেত্রে এক গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। ১৯৯১ সালের আগে দেশে কোনো বিলিওনিয়ার ছিল না—এখন দেশে এদের সংখ্যা শতাধিক। এদেশের ১ শতাংশ ধনীদের হাতে এখন প্রায় ৫৬ শতাংশ জাতীয় সম্পদের মালিকানা। আর মুদ্রাস্ফীতির লাগামহীন গতিতে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা সঙ্কটাপন্ন। গ্রাম-শহরে বেকারী বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতহারে। দেশে ২৫ কোটি টনেরও বেশি দানাশস্য উৎপাদন হলেও প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটান। এর উপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—মার্কিন ওষুধ কোম্পানির দাবি অনুযায়ী প্রদানমন্ত্রী হস্তক্ষেপে ১০৮টি জীবনদায়ী ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো হয় সেই কোম্পানিগুলির বাড়তি মুনাফার চাহিদা মেটাতে। এইভাবেই প্রতিদিন কোপ পড়ছে জনগণের ঘাড়ে আর ফুলে ফেঁপে উঠছে দেশী-বিদেশী লগ্নিপুঁজির ধারকেরা।

আসলে উদারনীতির একান্ত পূর্বপোষক মোদী সরকার যে পথে জাতীয় অর্থনীতিকে পরিচালনা করছে তা সমাজ ও জাতিকে এক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, সর্বজনীন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, কর্মসংস্থান সবটাই সঙ্কটগ্রস্ত। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধির সুযোগে দক্ষিণপন্থা বিপজ্জনকভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ তীব্র লড়াই আন্দোলনই পারে এই বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে। এই পথেই এগোতে হবে আমাদের। □

কেন্দ্রে মোদী সরকারের দুর্নীতি

দেবাশীষ রায়, শুভেন্দু মানিক্য সেনগুপ্ত

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ইউপিএ-২ সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী তাঁর নির্বাচনী প্রচারে দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন—(১) দুর্নীতি মুক্ত, কেলেঙ্কারি মুক্ত স্বচ্ছ সরকার উপহার দেবেন। (২) বিদেশ থেকে কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন। কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারের বিপুল ঢক্কানিনাদে দেশের ৩১ শতাংশ মানুষের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচিত, নিজেকে চা-বিক্রেতা বলে গর্ববোধ করা মোদীজি আজ প্রধানমন্ত্রী। চা বিক্রেতা থেকে দেশ বিক্রেতায় রূপান্তরিত প্রধানমন্ত্রী গত ১৬ এপ্রিল ২০১৫ কানাডার টরন্টোয় বুক বাজিয়ে বলেছিলেন যা তা বাংলা ভাষান্তর করলে দাঁড়ায়—"আগে দেশ পরিচিত ছিল 'স্ক্যাম ইন্ডিয়া' অর্থাৎ দুর্নীতির ভারত বলে, এখন আমরা চাই দেশকে 'স্কিলড্-ইন্ডিয়া' হিসাবে পরিচিত করতে।" টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে (২০-৫-২০১৫) বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ দাবি করেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি দূর করেছে'। নীতি-নৈতিকতা নিয়ে এই বাগাড়ম্বরের মাঝেই আই পি এল দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ও ফেরার ললিত মোদীর সাথে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের অনৈতিক আঁতাতের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় বিজেপি দল ও কেন্দ্রের সরকারের দুর্নীতিমুক্ত সরকারের প্রতিশ্রুতি যখন প্রশ্নের মুখে, ঠিক তখনই মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে সুপ্রিম কোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ, মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী পঙ্কজা মুণ্ডেসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ঘোটালার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানির বিরুদ্ধে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে অসত্য তথ্যের অভিযোগ দেশের মানুষের সামনে এই সত্যই হাজির করছে শাসকদলের জামা পরিবর্তন হয়, কিন্তু দুর্নীতি আর উদারনীতির সহাবস্থানের কোনো বদল হয় না এরা একে অপরের পরিপূরক।

ললিত মোদী-সুষমা স্বরাজ-বসুন্ধরা রাজে যোগ ঃ

৭ জুন ২০১৫, লন্ডনের 'দি সানডে টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ এমপি কিথ ভাজ গত বছরের জুলাই মাসে লন্ডনে ঘাঁটি গেড়ে থাকা ললিত মোদির পর্তুগাল যাতায়াত সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরি করবার জন্য সে দেশের অভিবাসন দপ্তরকে অনুরোধ করেন। তাঁর আবেদন কিথ ভাজ জানান যে ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ ললিত মোদিকে বিদেশ যাত্রার অনুমোদন দেওয়ার জন্য বারে বারে তদবির করেছেন। বিগত ২০১০ সালে থেকে এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট যে ললিত মোদীর বিরুদ্ধে Foreign Exchange Management Act (FEMA) অমান্য করার জন্য তদন্ত করছে, যার বিরুদ্ধে আইপিএল সংক্রান্ত চারটি মামলায় মোট ১ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এবং যিনি এ দেশের বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লন্ডনে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন গত ৫ বছর যাবত, তাঁর প্রতি কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রীর এই আচরণের সাফাই হিসাবে শ্রীমতী স্বরাজ বলেছেন, ক্যান্সার আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ললিত মোদী যাতে পর্তুগাল যেতে পারেন তাই 'মানবিক কারণে' তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন। শাসকদল এবং তাঁদের মূল নিয়ন্ত্রক আরএসএসও যথারীতি এহেন যুক্তিকে সমর্থন করে একজন অপরাধীকে সাহায্য করার বিষয়টিকে বৈধতা দিতে চেয়েছে। যখন দেশের বিদেশমন্ত্রক আইন ভাঙার দায়ে পাঁচ বছর আগেই ললিত মোদীর পাসপোর্ট বাতিল করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর আর্থিক অনিয়মের তদন্ত এখনও চলছে এবং অবিলম্বে বিচারালয়ের সামনে হাজির হওয়ার জন্য 'ব্লু-কর্নার' নোটিশ জারি হয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীর তাঁকে সাহায্য করতে এহেন তৎপরতা কার্যত নীতিহীনতারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃত সত্য এটাই যে ললিত মোদীর পরিবারের সঙ্গে সুষমা স্বরাজের পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। বিগত ২২ বছর যাবত সুষমা স্বরাজের স্বামী স্বরাজ কৌশল মোদীর আইনজীবী। আইপিএল টুর্নামেন্টে আর্থিক তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত ললিত মোদীকে আইনী সহায়তা দিয়েছে যে একদল আইনজীবী, তার অন্যতম বিদেশমন্ত্রীর কন্যা বাঁশুরী স্বরাজ। অর্থাৎ ললিত মোদী ও স্বরাজ পরিবার পেশাগত ও আর্থিক ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এর থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় বিদেশমন্ত্রীর সুপারিশের সঙ্গে কি স্বার্থ জড়িত। পর্তুগালে মোদীর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ললিত মোদীর যাওয়া সে দেশের আইনে বাধ্যতামূলক নয়। মোদীর স্ত্রী চাইলেই সেই হাসপাতালে তাঁর প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার হতে পারে। বিশেষ করে এই সেই হাসপাতাল, যে হাসপাতালের জন্য রাজস্থানে জমি পাইয়ে দিয়েছে মোদী-রাজে ব্রিগেড, সেখানে মোদীর স্ত্রীর চিকিৎসায় যে কোনো ত্রুটি হবে না তা বলাই বাহুল্য। তা সত্ত্বেও মোদিকে লন্ডনের বাইরে যেতে দেওয়ার জন্য ব্রিটেনের একাধিক মন্ত্রী ও আধিকারিককে সুষমা স্বরাজের ঘন ঘন চিঠি লেখা প্রমাণ করে যে বিজেপি সরকারের নীতি-নৈতিকতা নিয়ে বড়াই কতটা অন্তঃসারশূন্য।

ললিত মোদীর সাথে আরও গভীরভাবে যে ব্যক্তির নাম যুক্ত হয়ে গিয়েছে তিনি ঢোলপুরের

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির তৎপরতা

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপির রূপরেখা

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যপণ্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয়ের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বেতনের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় রোধে সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন সহ বিভিন্ন ভাতা নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেতন কমিশন গঠন করা হয়। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারীদের ধারাবাহিকভাবে বেতন কাঠামো ও ভাতা সমূহের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত বেতন কাঠামো ও ভাতাকে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে ধরে, অনেক-ক্ষেত্রে তার থেকেও উন্নত করে তা কার্যকর করে এসেছে। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি মেনে কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলিও তাদের অভিমত বেতন কমিশনের কাছে পেশ করেছে এবং অনেকক্ষেত্র তা গ্রহণ ও কার্যকর হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের পরবর্তী সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে দাবি উত্থাপন এবং সর্বোপরি প্রাক্তন বিচারপতি এ. কে. মাথুরের নেতৃত্বে গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন তাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করার পরবর্তীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে পুনরায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান সহ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের দাবি জানান হয় (পত্র নং কো-অর্ডি-৭১/১৫ তারিখ ২৩/১১/২০১৫)। কর্মচারীদের ধারবাহিক আন্দোলনের চাপে গত ২৭ নভেম্বর, ১৫ রাজ্য সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। টার্মস অফ রেফারেন্স পঞ্চম বেতন কমিশনের ধাঁচে গঠন করে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৬ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ৯০ দিনের মধ্যে বেতন কমিশনের কাছে সুপারিশ জমা দেওয়ার আহ্বান জানান হয়। ৮ সদস্য বিশিষ্ট ষষ্ঠ বেতন কমিশন সুচারুরূপে কাজ শুরু না করলেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ও বিভিন্ন ভাতা নির্ধারণের জন্য স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে জে সি এম (স্টাফ সাইড) ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন গৃহীত প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরীর দাবিকে মান্যতা দিয়ে অ্যাক্রয়েডের সূত্র মেনে তাদের স্মাকরলিপি পেশ করেছিল, সপ্তম বেতন কমিশন জে সি এম'র প্রস্তাবমতো ডঃ অ্যাক্রয়েডের সূত্র মেনে নিলেও অধিকতর সঠিকভাবে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের নামে কার্যত তথ্যের কারচুপি করে। জে সি এম-এর স্মারকলিপিতে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে চালের দাম কিলো প্রতি ৪০ টাকার ওপরে জানালেও কমিশন ইন্ডিয়ান লেবার ইনস্টিটিউট, সিমলা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে চালের দাম কিলোপ্রতি ২৫.৯৩ টাকা ধার্য করে। তেমনি, ডালের দাম কিলোপ্রতি ৯৭.৮৪ টাকা ইত্যাদি। ফলে স্মারকলিপিতে উল্লিখিত ২০১৪'র জানুয়ারি মূল্যস্তরে ন্যূনতম মাসিক বেতন ২৬০০০ টাকা হলেও কমিশনের হিসাবে ২০১৬ সালে ন্যূনতম বেতন ১৮০০০ টাকা। দাবি ছিল প্রস্তাবিত ন্যূনতম বেতন ২৬০০০ টাকা কে বর্তমান ন্যূনতম বেতন ৭০০০ দিয়ে ভাগ করলে যে ৩.৭ ভাগফল পাওয়া যায় তাই হবে নতুন বেতন নির্ধারণের গুণিতক। কিন্তু কমিশনের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ন্যূনতম মাসিক বেতন ১৮০০০ টাকা হলে বেতন নির্ধারণের গুণিতক (ফিটমেন্ট ফর্মুলা) হবে ২.৫৭। এর অর্থ হচ্ছে একজন কর্মচারীর মূল বেতন ১.১.২০১৬ তারিখে ১০০ টাকা হলে নতুন বেতনক্রমে পাবেন ২৫৭ টাকা। ইতিমধ্যে তিনি পাচ্ছেন ২২৫ টাকা (মূল বেতন ১০০ + মহার্ঘভাতা ১২৫ টাকা)। তাহলে সপ্তম বেতন কমিশনজনিত বৃদ্ধি ঘটছে (২৫৭-২২৫) ৩২ টাকা বা ১৪.২ শতাংশ মাত্র। যা বিগত বেতন কমিশনগুলির তুলনার বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন তাই নয়, মুদ্রাস্ফীতির সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মধ্যবর্তী সময়কালে ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচকের নিরীখে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৭৩ শতাংশ। বর্তমান সময়কালে তা বেড়ে ১২০ শতাংশ, ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী করার সময় বেতন বৃদ্ধি ঘটেছিল জি ডি পি'র .৭৭ শতাংশ অথচ এই সময়কালের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি ঘটা সত্বেও কমিশন সুপারিশ করেছে জিডিপি'র .৬৫ শতাংশ। দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, বাঙ্গালুরু, ত্রিবান্দ্রম, হায়দরাবাদ ইত্যাদি সারা দেশের ৮টি জায়গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামের গড় হিসাব করা হয়। এই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে চাল, গম, চিনি, শাক-সব্জি, ফল, দুধ, ভোজ্য তেল, মাছ-মাংস-ডিম, জামা-কাপড় ইত্যাদি দামের গড় তিনটি ইউনিটের (কর্মচারী ও দুটি সন্তান ধরে নিয়ে) দাঁড়ায় মাসে ১১৩৪৪ টাকা। এর সাথে বাড়ি ভাড়া, সরকার নির্ধারিত কর সর্বোপরি ১৯৯১ সালের সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্বালানি, বিদ্যুৎজনিত ব্যয়, পারিবারিক অনুষ্ঠানের ন্যায় সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি খাতে ব্যয় বরাদ্দ ২৫ শতাংশ যুক্ত করে মোট দাড়ায় ২৬০৭৫ টাকা। সেই নিরিখে দক্ষ কর্মীর ২৬০০০ টাকা ন্যূনতম বেতন ধার্য করা হয়। পারিবারিক চাহিদা নিরসনে ডঃ অ্যাক্রয়েডের ৩ জন সদস্য পিছু একটি পরিবারের সংজ্ঞা কখনই বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী, দুটি সন্তান ছাড়াও উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল বাবা-মাকে যুক্ত করলে ন্যূনতম বেতন দাঁড়ায় ৪৩,৩৩০ টাকা। তদ্‌সত্ত্বেও জে সি এম (স্টাফ সাইড) ৩ জন সদস্য পিছু একটি পরিবারের হিসাবে ন্যূনতম বেতন ২৬০০০ টাকা দাবি করে। ইতিপূর্বে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকেও ৪ জনের ইউনিট ধরে পঞ্চম বেতন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল।

ক্রমিক নং	পে স্কেল নং	বর্তমান পে ব্যান্ড	পে ব্যান্ড নং	গ্রেড পে	পে-স্কেলের প্রস্তাবিত ন্যূনতম
১	স্কেল-১	৪৯০০—১৬২০০	পিবি-১	১৭০০	২৪,৫০০
২	স্কেল-২	৪৯০০—১৬২০০	পিবি-১	১৮০০	২৫,৩০০
৩	স্কেল-৩	৫৪০০—২৫২০০	পিবি-২	১৯০০	২৮,৫০০
৪	স্কেল-৪	৫৪০০—২৫২০০	পিবি-২	২১০০	৩০,০০০
৫	স্কেল-৫	৫৪০০—২৫২০০	পিবি-২	২৩০০	৩১,৮০০
৬	স্কেল-৬	৫৪০০—২৫২০০	পিবি-২	২৬০০	৩৪,৫০০
৭	স্কেল-৭	৫৪০০—২৫২০০	পিবি-২	২৯০০	৩৮,৯০০
৮	স্কেল-৮	৭১০০—৩৭৬০০	পিবি-৩	৩২০০	৪১,৭০০
৯	স্কেল-৯	৭১০০—৩৭৬০০	পিবি-৩	৩৬০০	৪৪,৭০০
১০	স্কেল-১০	৭১০০—৩৭৬০০	পিবি-৩	৩৯০০	৪৯,৭০০
১১	স্কেল-১১	৭১০০—৩৭৬০০	পিবি-৩	৪১০০	৫২,৮০০
১২	স্কেল-১২	৯০০০—৪০,৫০০	পিবি-৪	৪৪০০	৫৫,৫০০
১৩	স্কেল-১৩	৯০০০—৪০,৫০০	পিবি-৪	৪৬০০	৫৭,৫০০
১৪	স্কেল-১৪	৯০০০—৪০,৫০০	পিবি-৪	৪৭০০	৬১,৮০০

চতুর্থত, ক্যাডারগুলির মূল্যায়ন ও তাদের কাজের মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠন করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুপারিশ করার জন্য বেতন কমিশনকে বলতে হবে।

পঞ্চমত, সকল স্তরের কর্মচারীদের ন্যায্য এবং আইন সম্মত দাবিগুলির মীমাংসা করার জন্য কমিশন যথাযথ গুরুত্ব দেবে।

নিয়োগ বিধি বিষয়ে ঃ

পূর্বে রাজ্য সচিবালয় ও অধিকারে লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে এবং রিজিওন্যাল স্তরে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগ করা হতো, পরবর্তীকালে প্রশাসনে আরও স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগের স্বার্থে রিজিওনাল স্তরেও পি এস সি বা লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে যথার্থ কারণ ছাড়াই স্টাফ সিলেকশন কমিশনের ন্যায় বিভাগীয় কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের আদেশনামা জারি করে নিয়োগ বিধির পরিবর্তন করা হয়। অযথা এই ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা সর্বোপরি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার কোন সদর্থক পদক্ষেপ না থাকায় বেকার যুবক-যুবতীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই জটিলতা দ্রুত কাটানোর লক্ষ্যে লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে সমস্ত স্তরের নিয়োগের সুপারিশ করার দাবি করা হচ্ছে।

নীতিগত বিষয়সমূহ ঃ

যে বিষয়গুলিকে বিচার্যের মধ্যে রেখে বেতন কমিশনকে সুপারিশ করতে হবে তা হল, প্রথমত, বেতন এবং মহার্ঘ ভাতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে যেসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অগ্রগতি আছে তাকে ধরে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, বকেয়া ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দিয়ে মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করে বেতন কাঠামো গঠন করতে হবে। তৃতীয়ত, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ সমূহ যা এখনও পর্যন্ত অমিমাংসীত আছে তা রূপায়িত হয়েছে ধরে নিয়ে বেতনক্রম সম্পর্কে সুপারিশ করতে হবে।

সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন না করায় জে সি এম (স্টাফ সাইড)-এর পক্ষ থেকে যে ভিত্তির উপর দাবি উত্থাপন করা হয়েছে তা সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও সেইমতো ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবিত বেতনক্রম ঃ

সপ্তম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পূর্বতন গ্রেড-পে'র পরিবর্তন করে বেতনক্রম চালু করার যে প্রস্তাব জেসি এম (স্টাফ সাইড) দিয়েছিল তাকে গ্রহণ করেছে। স্টাফ সাইডের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে রাজ্যের ক্ষেত্রেও বেতনক্রমে সর্বনিম্ন বেতনগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে পূর্বতন ন্যূনতম বেতন এবং গ্রেড-পে'র সমষ্টির সঙ্গে পূর্বতন চারটি পে-ব্যান্ডের সঙ্গে যথাক্রমে ৩.৭১, ৩.৯০, ৪.০৪৯ ও ৪.১৪ গুণ করে। এরপর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যুক্ত করে তৈরি হয়েছে 'পে ম্যাট্রিক্স'। পুরনো থেকে নতুন হারে বেতন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মূল বেতন ও গ্রেড পে'র সমষ্টিকে ৩.৭৩ দিয়ে গুণ করে যে অঙ্কে পৌঁছান যাবে (পে ম্যাট্রিক্স এর তার স্তরের (লেভেল) উচ্চতর নিকটবর্তী অঙ্কই হবে মূল বেতন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের গ্রুপ ডি পদ অবলুপ্তির কারণে পৃথক বেতনক্রম নেই। কিন্তু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গ্রুপ ডি পদে কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন (৪৯০০+১৭০০) ৬৬০০ × ৩.৭১ হিসাবে ২৪৪৮৭ অর্থাৎ ২৪,৫০০ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় ওপেন এন্ডেড বা বেতনক্রমের শেষটা খোলা থাক এমন প্রস্তাব করেছি বেতনক্রমে যা প্রস্তাব করা হয়েছে তা নিচের সারণীতে উল্লেখ করা হল।

বার্ষিক বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট ঃ

বর্তমানে বেশিরভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং ব্যাঙ্কগুলিতে ইনক্রিমেন্টর পরিমাণ হলো ৫ শতাংশ। সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে স্টাফ সাইড ৫ শতাশং। সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে স্টাফ সাইড ৫% হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট করার শ্রস্তার করেছে। আমরাও অনুরূপ প্রস্তাব করছি। একই সাথে আমরা এটাও বলতে চাই যে, একটিমাত্র ইনক্রিমেন্টর তারিখ যা পঞ্চম বেতন কমিশন থেকে লাগু হয়েছে, নানাবিধ জটিলতা ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে সুপারিশ করছি প্রশাসনিক সুবিধার্থে দুটি ইনক্রিমেন্টের দিন ধার্য হোক। একটি ১ জানুয়ারি ও দ্বিতীয়টি ১ জুলাই নতুন নিয়োগ/পদোন্নতি যাঁদের হবে ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুনের মধ্যে তাদের ইনক্রিমেণ্ট হোক ১ জানুয়ারি। একইভাবে ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর যাঁদের পদোন্নতি বা নিয়োগ হবে তাঁদের ইনক্রিমেন্ট হোক ১ জুলাই। এছাড়াও যারা ৩০ জুন বা ৩১ ডিসেম্বর অবসর নেবেন তাদের চাকরির শেষ দিনে একটা ইনক্রিমেন্ট মঞ্জুর করা হোক।

ফিটমেন্ট সূত্র ঃ

অতীতে বেতন কমিশন কার্যকরী হলে স্বল্পকালীন চাকরিরতা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘসময় ধরে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের তুলনায় বেশি লাভবান হয়েছেন। এই বৈষম্য নিরসনে বর্তমান ৬৬০০ এবং ২৪৫০০ অর্থাৎ ৩.৭১ গুণ সর্বত্র প্রয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ

বেশিরভাগ দপ্তরে দীর্ঘদিন কাজ করার পর পদোন্নতি ধার্য, তা ছাড়াও উচ্চপদে শূন্যস্থান থাকাও অন্যতম বিচার্য। এই অবস্থায় পদোন্নতির প্রাপ্তি যৎসামান্য হলে তা থেকে হতাশার জন্ম নেয়, যা বর্ধিত দায়িত্ব প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও বহু ক্ষেত্রে পদোন্নতি সাথে বদলীও হতে হয়। এই কারণে পদোন্নতির সাথে বদলীও হতে হয়। এই কারণে পদোন্নতি বাড়তি কোন আকর্ষণ তৈরী করতে পারে না। তাই, পদোন্নতির ক্ষেত্রে ফীডার ক্যাডারে দুটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে উচ্চতর লেভেল ফিক্সেসন করতে হবে।

আবার, পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত কর্মচারীরা মোট চাকরিকালে ৩ বার পরবর্তী বেতন কাঠামোর যাওয়ার সুযোগ পান। এর পরিবর্তন করে নন্ ফাংশন্যাল পদোন্নতি ৮ বছর, ৭ বছর, ৬ বছর এবং সর্বশেষ ৫ বছরে অর্থাৎ মোট চাকরি জীবনে ৪ বার সুযোগ দিতে হবে।

হায়ার ইনিশিয়াল/স্পেশাল পে ঃ

সাধারণ ভাবে আমরা এর পক্ষে নই। পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার মধ্য দিয়ে সোশাল পে বাতিল করা হয়। পরবর্তীকালে নানা জটিলতা উদ্বুদ্ধ হওয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে তা পুনরায় চালু করা হয়। তাই, বিশেষ ক্ষেত্রে স্পেশাল পে বা হায়ার ইনিশিয়াল একান্তই যদি বা হায়ার ইনিশিয়াল ৩.৭১ গুণিতকে ১০০ এর পরবর্তী মাল্টিপিল-এর কার্যকরী করা যেতে পারে।

বাড়ি ভাড়া ভাতা ঃ

১৯৬৭ সাল থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ১০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা পেয়ে আসছেন ১৯৭৭ সালে তা বেড়ে ১৫ শতাংশ হয়। তৎপরবর্তীতে বাজার দরের বিপুল বৃদ্ধি ঘটা সত্বেও একই হার বহাল থাকে। তাই বর্তমান হারকে বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ১৮ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়ছে।

মহার্ঘ ভাতা ঃ

ভোগ্য পণ্যের মূল্যসূচক মেনে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় বছরে দু'বার জানুয়ারি এবং জুলাই মাস থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে মহার্ঘভাতা ঘোষণার স্থায়ী প্রক্রিয়া চালু করার দাবি করা হয়েছে।

মহার্ঘ ভাতা ৫০ শতাংশ হয়ে গেলেই তা মূলবেতনের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং ১০০ শতাংশ পূর্ণ হলেই নতুন করে বেতন কাঠামো পুন: মূল্যায়ণ করতে হবে। প্রতি ৫ বছর অন্তর পে রিভিউ কমিটি গঠনের সুপারিশ করতে হবে, যা ইতিমধ্যে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে চালু হয়েছে।

চিকিৎসা ভাতা ঃ

বর্তমান হারের অন্তত ৩ গুণ বৃদ্ধি করে ন্যূনতম ১০০০ টাকা করতে হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বীমরা প্রকল্পকে অক্ষুন্ন রেখে পরিষেবা বৃদ্ধি করতে হবে। বহিঃবিভাগের আওতাভুক্ত কিছু চিকিৎসাকে ক্যাশলেসের আওতায় এনে আর্থিক সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

এছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ,

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

জে এন ইউ কাণ্ড, অসহিষ্ণুতা এবং দেশপ্রেম

মানস কুমার বড়ুয়া

স্বদেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজরা, ভগৎ সিং প্রমুখদের আত্মবলিদানকে। যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, দেশকে স্বাধীন করা। তাঁদের মতো কয়েক সহস্র দেশপ্রেমিকের আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারত স্বাধীন হয়েছিল। এটা যেমন সত্য আবার সংখ্যায় অল্প হলেও এমন ভারতবাসী বা এমন ভারতীয় সংগঠনও ছিল যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালি করেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে কোনো সংযোগ ছিল না রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা আর এস এস-এর। সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্ব সাভারকর ব্রিটিশদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন এটা সত্য; কিন্তু আরও করুন সত্য হল যে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন না করার মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। সাভারকদের মতো ব্যক্তিকেই আর এস এস 'বীর'-এর মর্যাদা দেয়। এরকম একাধিক উদাহরণ আর এস এস সম্পর্কে দেওয়া যায়। হাস্যকর হলেও এটাই ঘটনা যে সেই হিন্দুত্ববাদী আর এস এস আজকে ভারতবাসীকে দেশপ্রেম শেখাতে চাইছে। দেশপ্রেমের মুখোশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, যা ওদের আদর্শ, তাকে ভারতবাসীর মনে চালান করতে চাইছে। এই কাজে ওরা ব্যবহার করছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় আছে আর এস এস পরিচালিত রাজনৈতিক দল বিজেপি। ওদের মতে ভারতকে ভালোবাসলেও যদি 'ভারত মাতা কি জয়' এই স্লোগান না দেয় তবে সে বা তাঁরা দেশপ্রেমিক নয়। ওরা চায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশপ্রেমের প্রমাণ হিসেবে ওদের নির্দিষ্ট করা উচ্চতার পোস্টে ভারতের পতাকা ওড়াতে হবে। ঐ নির্ধারিত উচ্চতার এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই হয়ত সেই বিশ্ববিদ্যালয় দেশদ্রোহী হবে। এইভাবে ফ্যাসিস্ট কায়দায় ফতোয়া জারি করতে চাইছে ওরা। উগ্র জাতীয়তাবাদ ওদের মূলধন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত মুসলিমগণ ওদের টার্গেট। সম্প্রতি দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর এস এস-বিজেপি আবার প্রবল 'দেশপ্রেমী' হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের নেতা কানহাইয়া কুমারকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয় ষড়যন্ত্র। কি সেই ষড়যন্ত্র? দেশদ্রোহীতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য কী? সেই প্রসঙ্গগুলিকে নিয়েই এই নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

সম্প্রতি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কিছু ঘটনা জাতীয় রাজনীতির আঙ্গিনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্যাসিস্ট মানসিকতার আরও একটি উদাহরণ জে এন ইউ-তে ঘটে যাওয়া ঘটনা। জে এন ইউ-তে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ একটি অনুষ্ঠান সংগঠিত করে ছাত্রদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই এই অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করা হয় এবং কিছু অনভিপ্রেত স্লোগান তোলা হয়। আর এস এস-এর হিন্দুত্বের মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ প্রতিবাদ করতে এলে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ও ধাক্কাধাক্কি হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে পুলিশ আসে। অল্প কিছুক্ষণ পরে, ছাত্ররা যে যার ঘরে ফিরে যায়। পুলিশ কোনোরকম এফ আই আর নথিভুক্ত করেনি। গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ছাত্র সংসদের সভাপতি এবং এ আই এস এফ নেতা কানহাইয়া কুমার। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা নেন। দু'দিন পর জি টি ভি চ্যানেলে একটি ফুটেজ দেখানো হয় যে, সেখানে বিভিন্নরকম স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানও ছিল। যদিও পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে, ঐদিন ফুটেজে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ কারসাজি করে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান ঢুকিয়েছিল। বিবেকের তাড়নায় এই সংস্থার এক উচ্চপদস্থ সাংবাদিক পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগ পত্রে এই কারসাজির কথা জানান। পরবর্তীকালে 'টাইমস্ নাউ' চ্যানেলও একই ধরনের কাজ করে।

যাই হোক ওই ফুটেজকে ব্যবহার করে সক্রিয় হয় সংঘ পরিবার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং অতি সক্রিয় হয়ে দিল্লি পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। সমস্ত দেশ জুড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে জে এন ইউ-র মতো একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংঘ পরিবার।

ঘটনা হল ৯ ফেব্রুয়ারির দু'দিন পর ১১ তারিখ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া কুমার ছাত্রদের সামনে একটি বক্তব্য রাখেন। এই সভার ভিডিও ফুটেজ কারসাজি করে দেখানো হয় টিভি চ্যানেলে। তারপর দিনই (১২ ফেব্রুয়ারি) ঐ বক্তব্য রাখা এবং ৮ ফেব্রুয়ারি একটি শোভাযাত্রায় অংশ নেবার কারণে 'দেশদ্রোহিতা'র তক্মা দিয়ে কানহাইয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৫ তারিখ কানহাইয়াকে পাতিয়ালা হাউস কোর্টে নিয়ে আসা হলে সেখানে আর এস এস সহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং বিজেপির কর্মী-নেতারা কানহাইয়াকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে এবং ব্যাপক মারধর করে। প্রহারকারীদের মধ্যে একজন বিজেপি আইনজীবী ও বিধায়কও ছিলেন। এমনকি সাংবাদিকরাও প্রহৃত হন ঐদিন, প্রহৃত হন কানহাইয়ার সমর্থনে কোর্টে হাজির হওয়া অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরাও। এর প্রতিবাদে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা দিল্লির প্রেস ক্লাব থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মিছিল করে। গোটা দেশ হিন্দুত্ববাদীদের এই জঘন্য কার্যকলাপ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। পরবর্তীকালে কানহাইয়া জামিনে মুক্ত হয়ে জে এন ইউ ক্যাম্পাসে গিয়ে উজ্জীবিত বক্তব্য রাখেন। যে বক্তব্যের জন্য কানহাইয়া গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, সেই একই বক্তব্য তিনি মুক্তি পেয়েও বলেন। কানহাইয়া বলেছিলেন—গরিবী, ক্ষুধা, জাতি-বৈষম্য, আর এস এস, সাম্প্রদায়িকতা থেকে আজাদীর কথা। কানহাইয়া ছাড়া আরও দুজন ছাত্রকে পরবর্তীকালে 'দেশদ্রোহিতা'র অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। তারাও পরবর্তীকালে জামিন পেয়ে যায়।

প্রশ্ন হল, জে এন ইউ-তে প্রগতিবাদী ধারাকে আক্রমণ করতেই কি এই ধরনের অপপ্রয়াস? জে এন ইউ-তে সংঘ পরিবারের নজর দীর্ঘদিন ধরে। ওখানকার ছাত্রদের বামপন্থী প্রগতিশীল ধারা, মুক্তমনের চর্চা মনুবাদ আঁকড়ে ধরা সংঘীদের পছন্দ নয়। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার নিরঙ্কুশ হবার পর জে এন ইউকে অবজ্ঞা করার দীর্ঘদিনের মনোবাঞ্ছা পুরণ করতেই ওখানে উগ্র জাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার করা হয়েছে। তার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আবার 'অসহিষ্ণুতা'র প্রসঙ্গ চলে এসেছে। দেশের মানুষ কি খাবেন, কি পরবেন, কি ধরনের আচরণ করবেন—এই সব ঠিক করে দেবার পাশাপাশি সংঘীরা দেশপ্রেমের সংজ্ঞাও নির্ধারিত করে দিতে চায়। দেশপ্রেম ওদের মনমতো না হলেই অসহিষ্ণু হয়ে দেশদ্রোহীর তক্মা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, দুটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি ঘটনায় নিহত (রোহিত ভেমুলা) ও আক্রান্ত ছাত্র দুটি কিন্তু শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান। হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মহত্যাকারী রোহিতের মা দর্জির কাজ করে সংসার চালান আর কানহাইয়ার বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং মা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।

দেশদ্রোহিতার সংস্থা তাহলে কী? কোন্ আচরণকেই বা দেশদ্রোহীতা বলে? বৃটিশ শাসকদের তৈরি করা আইন এখনও আমাদের দেশে বলবৎ রয়েছে। শাসকদল বা সরকারের কোনো মতবাদ, কোনো রাজনৈতিক অবস্থান পছন্দ না হলেই দেশদ্রোহিতার লেবেল সেঁটে জেলে পাঠানো এখনও দস্তুর। কানহাইয়া সহ জে এন ইউ-র অন্য ছাত্ররা শুধুমাত্র স্লোগান তোলার দায়ে দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত।

১৯৬২ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট দেশদ্রোহীতার প্রসঙ্গে একাধিক রায় দিয়েছে। রায়গুলির সার কথা হল এই যে, কোনো ভাষণ বা স্লোগানকে দেশবিরোধী বা দেশদ্রোহী বলা যাবে না, যতক্ষণ না প্রত্যক্ষভাবে তা হিংসার উসকানি দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বলবন্ত সিং বনাম পাঞ্জাব সরকারের মামলা। এই মামলায় অভিযুক্তরা ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার কয়েক ঘণ্টা পরেই 'খালিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন। কিন্তু দেশের সুপ্রিম কোর্ট এদের বেকসুর খালাস করে, কারণ তাদের দেওয়া স্লোগানে কোনো হিংসার উসকানি ছিল না। তাঁদের রায়ে বিচারপতিরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন—"Raising of some lonesome slogans a couple of times by two individuals, without anything more, did not constitute any threat to the government of India as by law established no could the same give rise to feelings of enmity or hatred among different communittes or religions or other groups."

জে এন ইউ-তে ঠিক এমনই কিছু বিক্ষিপ্ত স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল, তার পরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে কোনরকম অশান্তি হয়নি এবং কানহাইয়া কুমারও দেশবিরোধী কোনো স্লোগান দেন নি। তা সত্ত্বেও, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজকে কালিমালিপ্ত করা হল কেন্দ্রীয় সরকার ও পুলিশ দ্বারা।

এরা এতই পরমত অসহিষ্ণু যে এদের নেতারা কেউ কানহাইয়া কুমারের জিভ কাটলে ইনাম ঘোষণা করলো, কেউ আবার মাথার দামও ঘোষণা করলো। দিল্লীর বিজেপি বিধায়ক আদালতে ঢুকে জে এন ইউ-র ছাত্রদের পিটিয়ে ঘোষণা করলেন যে বন্দুক থাকলে উনি তাদের গুলি করে দিতেন। রাজস্থানের আরেক বিধায়ক জে এন ইউ-র ছাত্রদের নামে নানা কুৎসা করলেন। একজন সাধুর ভেকধারী বিজেপি নেতা বলে দিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি নাকি পাকিস্তানী জঙ্গী হাফিজ সইদের টাকায় চলে, এমনকি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন ওখানকার ছাত্রদের সঙ্গে হাফিজ সইদের যোগাযোগ আছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশের এরকম আরও উদাহরণ আছে।

সংঘ পরিবারের কাছে আরেকটি আপত্তিকর দিক হল কানহাইয়া কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাস করেন। আর এস এস এবং বিজেপি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রদায়িক ও হিন্দুত্ববাদী শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতে চায়। প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং সংঘ পরিবার শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন ধাঁচে গড়ে তুলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে হিন্দুত্ববাদী স্বৈরতান্ত্রিক মডেল বানাতে চায়। সেই কারণেই তারা সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এবং প্রতিবাদী মতামতকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' তক্মা দিতে চাইছে। হিন্দুত্ববাদীরা মনে করে, জে এন ইউ হল বৌদ্ধিক চর্চা ও গবেষণার একটি বিপজ্জনক কেন্দ্র এবং এখানে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে পরিবর্তনকামী গণতান্ত্রিক দর্শনচিন্তা তুলে ধরা হয়। এই কারণেই তারা জে এন ইউ-কে 'রাষ্ট্রবিরোধীদের আখড়া' আখ্যা দিয়ে থাকে। আশার কথা হল সাম্প্রদায়িক শক্তির এই অপকর্মের বিরুদ্ধে দেশের সব অংশের মানুষ, প্রায় সব ধরনের সংগঠন প্রতিবাদে মুখর হয়েছে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই। শুধু দেশ নয়, বিদেশ থেকেও প্রতিবাদ এসেছে। বিদেশের প্রায় ৪০০ কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয় জে এন ইউ-র ছাত্র শিক্ষকদের প্রতি সহমর্মিতা স্থাপন করেছে। পাশে দাঁড়িয়েছেন নোয়াম চমস্কি, ওরহান পামুকের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা। নীরব থেকেছে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস।

১১ ফেব্রুয়ারি জে এন ইউ-তে যে বক্তব্যটি রেখেছিলেন কানহাইয়া কুমার, সেই বক্তব্যের প্রতিটি শব্দেই ছিল হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং সমাজ বদলের স্বপ্ন। তিনি প্রকৃত স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন, খুলে দিয়েছিলেন আর এস এস বিজেপি-র দেশপ্রেমের মুখোশ। এতেই এদের গায়ে জ্বালা ধরেছিল। কানহাইয়ার সেই বক্তব্যের কিছু অংশ দিয়েই এই লেখা শেষ করবো।

—"তারা হল সেইসব লোক, যারা তেরঙ্গা পতাকা পোড়ায়। তারা সেই সাভারকারের অনুগামী যিনি ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তারা সেইসব ব্যক্তি, হরিয়ানায় যারা বিমানবন্দরের নাম পাল্টে দিয়েছে। যেখানে ভগৎ সিং-এর নামে একটি এয়ারপোর্ট ছিল, খাট্টার সরকার এখন তার নাম রেখেছে একজন সংঘীর নামে, যিনি আর এস এস-র সহযোগী। আমি যা বলতে চাই তা হল আমাদের আর এস এস-এর থেকে স্বদেশ প্রেমের সার্টিফিকেট নেয়ার দরকার নেই। জাতীয়তাবাদী হিসেবে আর এস এস-এর শংসাপত্র আমাদের দরকার নেই। আমরা এই দেশের লোক। এই দেশকে আমরা ভালোবাসি। এদেশে জনসংখ্যার আশি ভাগ গরিব মানুষের জন্য আমরা লড়াই করি। আমাদের কাছে এটাই দেশভক্তি।... ভারতের সংবিধানে আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। এটাই আমরা জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে যদি কেউ সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করে, হোক না সে সংঘী আমরা তাদের বরদাস্ত করবো না। সংবিধানে আমাদের বিশ্বাস আছে।... মনুস্মৃতিতে আমাদের বিশ্বাস নেই। এই দেশের জাতপাত ব্যবস্থাকে আমরা মান্যতা দিই না।... আমরা চিহ্নিত করেছি জাতব্যবস্থার আসল মুখকে, মনুবাদের প্রকৃত মুখ, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে যোগসাজশের আসল স্বরূপকে। এই সব মুখগুলির আসল রূপ উন্মোচিত করে দিতে হবে। আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হবে, এবং সেই স্বাধীনতা সংবিধান ও সংসদের থেকেই আসবে এবং আমরা তা অর্জন করবো।"

(১১ ফেব্রুয়ারি '১৬-তে প্রদত্ত কানহাইয়ার এই বক্তব্য ১৬ ফেব্রুয়ারি দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ছাপা হয়। শিরোনাম অনুবোদ করলে দাঁড়ায়—"এর মানে যদি দেশবিরোধী হয় তবে ঈশ্বর আমাদের দেশকে রক্ষা করুন।" সেখান থেকেই সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হল।) □

আন্তর্জাতিক ভাষা শহীদ দিবস ও কিছু কথা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রবিবার ঃ আন্তর্জাতিক ভাষা শহীদ দিবস। রাজ্যে ভাষা শহীদ বেদী (কার্জন পার্কে) উদ্যানে বিশিষ্টরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন প্রতিবার যেমন হয়। সরকারও সেই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হয়। ২০১৬-তে পাল্টা, দেশপ্রিয় পার্কে কলকাতা কর্পোরেশন ও রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে ভাষা শহীদ স্মারক নির্মাণ করলেন। সেখানেই সরকারী অনুষ্ঠান হলো। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকলেন। গান হলো তারপর হঠাৎ চলে যাবার সময় সাংসদ মুকুল রায়কে ইশারায় ডাকলেন, থতমত খেয়ে রায় মহাশয় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সাজানো ফুলের টবে ঠোক্কর খেয়ে। দ্রুত সামলে নিলেন অন্যদের সহায়তায়। সময়টা খবরের কাগজ অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা।

একদা যার প্রতাপে বাঘে বলদে একঘাটে জল খেত তিনি ফুলের টবে ঠোক্কর খেয়ে ধরাশায়ী এটাই কাকতলীয়। এ রাজ্যে ফুলের হাত ধরে যে কার্যত তাণ্ডব চলছে, জনজীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই যখন এই অন্তরের প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যার প্রমাণ সেদিনই দুপুরে দুকুল ভাসানো মিছিল প্রমাণ করেছে বামপন্থীদের উদ্যোগে তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। শহরের দু'দুটো বড় বড় অনুষ্ঠান একদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতাজি ইন্ডোরে জমায়েত, অন্যদিকে দেশপ্রিয় পার্কে রাজ্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং গৌরবময় উপস্থিতিতে সরকারী অনুষ্ঠান—দুটোকেই ম্লান করে দিয়েছে দুপুরে বামপন্থীদের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মিছিল। সব খবরই যাকে রাখতে হয় তিনি হকচকিয়ে ধরাশায়ী হয়ে গলেন। তাও আবার ফুলের টবে। রাজ্যে আসন্ন কোনো ঘটনার ইঙ্গিত না কি শুধুই কাকতালীয়।

যদিও নতুন এই ভাষা স্মারক সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ বর্তমানে মোহমুক্ত হয়েছেন। বর্তমান সরকার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন আর একটা শহীদ বেদী কেন? আমাদের মতো ঘরপোড়াদের রক্ত সন্ধ্যায় ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। শহীদের রক্ত কি ভাগাভাগি হতে চলেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী যত ব্যস্ততায় থাকুন প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে হলুদ ফুলের গোছা দিয়ে প্রতীকি বন্ধুত্বের বার্তা দিতে তাঁর কোনো ভুল হয়নি। এটাও কাকতলীয় সন্দেহ নেই। □

অশোক রায়

বিজ্ঞপ্তি

সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার ৪৫তম গ্রাহকবর্ষ শুরু হচ্ছে আগামী মে ২০১৬ থেকে। সমস্ত জেলা কমিটি, অঞ্চল কমিটি, অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলির কাছে দ্রুত গ্রাহক চাহিদা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

—পত্রিকা সম্পাদক

কেন্দ্রীয় সমাবেশ

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শনিবার **ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড অ্যানিমাল হাসব্যান্ড্রী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের** উদ্যোগে ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে এই সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যগণ যথাক্রমে অজিত ঘোষ, তপন বিশ্বাস ও ভুবন দাস। ১০ দফা দাবির প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে। এবং আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আমাদের করণীয় সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের অপর যুগ্ম সম্পাদক সুকুমার বেরা। দুটি প্রস্তাবের সমর্থনে ব্যাখ্যাসহ বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায় চৌধুরী। রায় চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন গত ২২ জুন ২০১৫ বেআইনী আদেশ বলে ডেয়ারীর প্রায় নয় শত শ্রমিক কর্মচারীকে গোটা দক্ষিণবঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে বিভিন্ন হাসপাতালে বদলী করা হয়। নয় মাসের মধ্যে সংগঠনের শ্রমিক কর্মচারীরা এই সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পুনরায় সংগঠনকে ঘুরে দাঁড় করাবার শপথ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরবর্তীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহসভাপতি চন্দন ঘোষ ১০ দফা দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আপনারা ডেয়ারীর শ্রমিক কর্মচারী বিগত দিনে বহু লড়াই সংগ্রামের সৈনিক এই ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তীব্র লড়াই সংগ্রাম করতে হবে। একই সাথে পশ্চিমবাংলায় আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে ডেয়ারীর শ্রমিক কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করবেন এই আহ্বান রাখছি।

এই মহতী সমাবেশে দুই জন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে লাইভস্ট ডেভে. এসোসিয়েশনের নেতা মানস সিংহ রায় এবং রাইটার্স বিল্ডিং গ্রুপ-ডি কর্মচারী সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা গণসঙ্গীত পরিবেশনা করেন। এই সমাবেশে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃত্বসহ দেড় শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

এই কর্মসূচীর প্রধান বক্তা ছিলেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতিতে একটি বড়ো পরিবর্তন ২০১৪ সালে মে মাসের লোকসভা নির্বাচন। এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছে। এর ফলে নয়া উদারনীতির আগ্রাসন, হিন্দুত্ববাদী শক্তির লক্ষ্য সাধনে পূর্ণ অপচেষ্টায় দক্ষিণপন্থী আক্রমণের দ্বার খুলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশ ব্যাপী স্বৈরতন্ত্রের বিপদ বাড়িয়ে তুলছে, পাশাপাশি ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলায় দানবীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্যায়ভাবে বদলী এবং ডেয়ারীর শ্রমিক কর্মচারীদের বেআইনীভাবে বদলী করার মধ্য দিয়ে গোটা সংগঠনকে আক্রমণের মুখে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আসন্ন পশ্চিমবাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান রাখেন।

এই কর্মসূচীতে চা বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের সাহায্যার্থে অর্থ প্রদান করা হয় মহাকরণ অঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে। পরিশেষে সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়। □

দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছেন তাতে শিল্পপতিরা আরও বেশি করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করতে পারবেন। নতুন আইনে ১৪টি শ্রম আইনের ধারা অনধিক চল্লিশজন শ্রমিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানে লাগু হবে না। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন লঙঘন করে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে কোনও আলোচনা ব্যতিরেকেই এই পরিবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে দেশের নব্বই শতাংশ শ্রমিকই শ্রম আইনের বাইরে থাকবে। রাজস্থান, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাটে আন্দোলন দমনে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তার সাক্ষ্য বহন করে।

শুধু বিলগ্নিকরণই নয়, 'মেগা স্ট্র্যাটেজিক সেল'-এর নামে সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির পরিচালনার ভার এবং স্ট্র্যাটেজিক সেক্টরের রেল, প্রতিরক্ষায় দেশি এবং বিদেশী পুঁজির ঢালাও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পি পি পি মডেলে। এই কনভেনশন দাবি করে যে, অবিলম্বে এই জনবিরোধী শ্রম আইন সংশোধন বাতিল করে শ্রম আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। ন্যূনতম মজুরি ১৮০০০ টাকা সহ সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই কনভেনশন রেল, প্রতিরক্ষা সহ ব্যাঙ্ক, টেলিকম, বিমা, পরিবহণ ইত্যাদি অংশের সংগ্রামের প্রতি সংহতি ও সমর্থন জানায়।

এই কনভেনশন সমস্ত ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছে নিম্নলিখিত আহ্বান রাখে—

১। জুন-জুলাই ২০১৬ প্রতিটি রাজ্যে ও জেলায় যৌথ কনভেনশন এবং প্রচারের মাধ্যমে কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বৃহত্তর অংশের মানুষকে সামিল করা।

২। ৯ আগস্ট ভারত ছাড়ো দিবসে দেশের সমস্ত রাজধানী ও প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলিতে সারা দিনব্যাপী গণ ধর্ণা-সত্যাগ্রহ কর্মসূচী পালন।

৩। ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। □

মোদী সরকারের দুর্নীতি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

রানী শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে, যিনি বর্তমানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। অনেকেই বলেছেন ২০০৩-২০০৮ সালে বসুন্ধরা রাজের প্রথম দফার মুখ্যমন্ত্রীত্বেরকালে রাজস্থানে সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ললিত মোদী। তার 'আমির হেরিটেজ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি' জয়পুরের কাছে দুটো পুরোনো হাভেলি কেনে, যেটাকে পরবর্তী গেহলট সরকার বেআইনী ব্যবসায়িক লেনদেনের অভিযোগে বাতিল করে দেয়। ইডির একটি তদন্ত রিপোর্ট বেরিয়েছে, ২০০৮ সালে বসুন্ধরার মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথম পর্বে ললিত মোদির সংস্থা আনন্দ হেরিটেজ হোটেলে প্রায় ২১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মরিশাসের একটি বেনামী সংস্থা। যার মধ্যে প্রায় ১১.৬৩ কোটি টাকা হাত বদল হয়ে পৌঁছায় বসুন্ধরার পুত্র তথা বিজেপি সাংসদ দুষ্মন্ত সিংয়ের মালিকানাধীন নিয়ন্ত হেরিটেজ হোটেলের অ্যাকাউন্টে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে ঋণ ও শেয়ারের দাম মেটানো বাবদ ললিত ঐ টাকা দিয়েছিলেন দুষ্মন্তের সংস্থাকে। কিন্তু ইডির বক্তব্য, দুষ্মন্তের সংস্থাকে ঘুরপথে (ভায়া মরিশাস লাইন) আর্থিক ফায়দা পাইয়ে দিতে শেয়ারের দাম কয়েকশো গুন বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। (আ.বা.প. ১৮-৬-১৫) বিদেশে পাচার করা কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা বড়াই করা দলের সাংসদের সংস্থায়ই কালো টাকা সাদা হয়ে ঢুকেছে। সরকারী সম্পত্তি ঢোলপুর রাজপ্রাসাদও ললিত যোগে বেসরকারী অভিজাত হোটেলে পরিণত হয়েছে বসুন্ধরা-দুষ্মন্তের বদান্যতায় 'ইন্ডিয়া টুডে' টিভি চ্যানেল ফাঁস করে দিয়েছে, বসুন্ধরা যখন রাজস্থান বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের নেত্রী ছিলেন, তখন ২০১১ সালের ১৮ আগস্ট ললিত মোদীর ভিসা আবেদনপত্রে সাক্ষী হিসাবে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন ঃ (বাংলা ভাষান্তরে) ''অভিবাসনের জন্য ললিত মোদী যে আবেদন করেছেন তার সমর্থনে আমি এই বিবৃতি দিচ্ছি, তবে একটি শর্তে যে, আমার এই সহায়তা কোনোক্রমেই যেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না হয়।'' (দ্য টেলিগ্রাফ ১৭-০৬-১৫) ভারতীয় কর্তৃপক্ষ না জানতে পারার শর্তে (কী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্র বিরোধী শর্ত!) ললিত মোদীর অভিবাসনের আবেদনে বসুন্ধরার সাক্ষী হওয়ার গোপন তথ্য আজ সর্বসমক্ষে বেরিয়ে পড়েছে। এছাড়াও জানা গেছে, ২০১২ ও ২০১৩ সালে ললিত মোদীর স্ত্রী যখন অপারেশনের জন্য পর্তুগালের হাসপাতালে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন স্বয়ং বসুন্ধরা।

অভাবনীয় দুর্নীতির অপর নাম ব্যাপম ঃ

প্রায় নিত্যদিন, বস্তুত নজিরবিহীন মৃত্যুমিছিল চলেছে মধ্যপ্রদেশে ২০০৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে, ২০১৫ সালের জুলাই পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪৭, যদিও মধ্যপ্রদেশ পুলিশের বক্তব্য মৃতের সংখ্যা ৩৭। আর্থিক কেলেঙ্কারি, প্রশাসনিক দুর্নীতি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অনেক হয়েছে। কিন্তু হাড়হিম করা রহস্য আর রাজ্য জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ কখনও তৈরি হয়নি, কোনো বিশেষ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে। শুধু ২০১৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই এ ধরনের মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, যাদের মধ্যে রয়েছেন 'ইন্ডিয়া টুডে'-র সাংবাদিক অক্ষয় সিং, যিনি ব্যাপম নিয়ে তদন্তমূলক রিপোর্ট লিখছিলেন, রয়েছেন জব্বলপুর মেডিক্যাল কলেজের ডিন ডাঃ অরুণ শর্মা যার মৃতদেহ দিল্লীর এক হোটেলে পাওয়া গেছে। ডাঃ শর্মা প্রচুর নথিপত্র ও প্রমাণ জমা দিয়েছিলেন।

মধ্যপ্রদেশ ব্যবসায়িক পরীক্ষা মণ্ডল সংক্ষেপে ব্যাপম হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকার অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সেল্ফ ফিন্যান্সড পর্ষদ। এই পর্ষদের পরিচালন কমিটিতে রয়েছেন বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শীর্ষে রাজ্যের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি। আগে শুধুই মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হত এই বোর্ডের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এই পর্ষদ বিভিন্ন কলেজে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, পলিটেকনিক, ফার্মাসি, নার্সিং, বিএম, কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন পাঠক্রম, বি-টেক-এর বিভিন্ন পাঠক্রম, প্রি মেডিক্যাল টেস্ট, হোমিওপ্যাথি, প্রাণি চিকিৎসা প্রভৃতি প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে আছে। এছাড়াও শিক্ষক, পুলিশ, চিকিৎসক নিয়োগও হয় ব্যাপমের মধ্য দিয়ে।

২০০৯ সালের এরকমই একটি প্রি-মেডিক্যাল টেস্টে কারচুপির অভিযোগ ওঠে। ইন্দোরের চক্ষু চিকিৎসক ও সমাজকর্মী আনন্দ রাই-এর এই সম্পর্কিত জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি ২০১১ সালে তার রিপোর্টে ভুয়ো পরীক্ষার্থী এবং টাকা লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে বলে জানায়। এরই ভিত্তিতে ২০১২ সালে বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) গঠিত হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে এসটিএফের তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ২০১২ সালের চাকরিতে নিয়োগের পাঁচটি পরীক্ষায় দুর্নীতি করেছে ব্যাপমের আধিকারিকরা দুর্নীতিগ্রস্থ আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালীদের আঁতাতে আসল পরীক্ষার্থীদের বদলে পরীক্ষা দিত অন্য মেধাবী ছাত্র, অবাধ টোকাটুকি, আগে নম্বর পরে উত্তর প্রভৃতি ঘটতো এবং এসবে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হতো। এসটিএফ ১১৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে, যার মধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঘনিষ্ঠ মাইনিং ব্যারণ সুধীর শর্মারও নাম ছিল, যিনি পরবর্তীতে খুন হয়েছেন। ডিসেম্বর মাসে এসটিএফ ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা (পিএমটি) কেলেঙ্কারিতে ৩৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র, অভিভাবক ও চার উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এসটিএফের এই তদন্ত ফল প্রকাশ্যে আসার পরই ৪০ জনের খুন অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ২০০৯ সালে ২১ নভেম্বর প্রথম অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় পিএমটি-র মিডলম্যান বিকাশ সিং ঠাকুরের। এ পর্যন্ত ১৫ জন পিএমটির মিডলম্যান এবং ২ জন পুলিশ নিয়োগের মিডলম্যান খুন হয়েছেন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও রাজ্যপাল রামনরেশ যাদবের বিরুদ্ধেও এই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ফরেস্ট গার্ড নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁর ছেলে শৈলেন যাদবের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, মার্চে তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, খুন হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত শর্মা। পুলিশ এখনও পর্যন্ত এ তদন্তে ২ হাজারের বেশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেও মূল অভিযুক্ত বিনোদ ভাণ্ডারী আজও ফেরার, অন্য রাঘব বোয়ালরাও ধরাছোয়ার বাইরে। উপরন্তু এই কেলেঙ্কারির সাক্ষী, অভিযুক্ত যারা তদন্তে সহযোগিতা করছেন, অক্ষয় সিং-এর মতো সাংবাদিক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষও ডিন যারা এই কেলেঙ্কারির সত্য উদ্‌ঘাটন করছেন তাঁদের খুন হতে হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ এই মৃত্যু মিছিলকে বন্ধ করে প্রকৃত অপরাধীদের সাজা দেবে বলে মধ্যপ্রদেশের সমাজকর্মী আনন্দ রাই, আশিস চতুর্বেদীরা মনে করছেন।

স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠায় সদা সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখার দাবী করা মোদিজী একবারও বলছেন না কি করে মহারাষ্ট্রের বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের মন্ত্রী পঙ্কজা মুণ্ডে বিনা টেন্ডারে একদিনে ২০৮ কোটি টাকার সামগ্রী কেনার বরাত দিচ্ছেন। তিনি মাননীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঘোষণা সংক্রান্ত ধোঁয়াশা নিয়েও নিশ্চুপ। তিনি একটিবারও বলছেন না যে, একজন, কালো টাকার কারবারির সাথে তাঁর দল ও মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের যোগাযোগ রাখাকে তিনি কী চোখে দেখছেন। বিরোধীরা যতই সুষমা-বসুন্ধরা-শিবরাজ-স্মৃতির পদত্যাগের দাবিতে সরব হন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল যে এদের পিছনে আছে দৃঢ়ভাবে প্রতিনিয়ত তার প্রমাণ মিলছে। 'প্রধান সেবক' হওয়ার দাবি করলেও মোদিজী যে আমজনতার পরিবর্তে দল ও পুঁজির দালালদের সেবক তা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। □

স্মারকলিপির রূপরেখা

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

অতিরিক্ত কাজ টিফিন অ্যালাউন্স পাহাড়, সুন্দরবন ইত্যাদি অঞ্চলে থাকাকালীন ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা ৩. ৭১ এর গুণিতকে বৃদ্ধি করার অনুরোধ করে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভ্রমণ ভাতা ঃ

১৯৯০ সালে চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ মতো ভ্রমণ ভাতার হারের পরিবর্তন হয়। দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে একই হার চালু আছে যদিও এই সময়কালে মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে খরচ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই রাজ্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কেন্দ্রীয় হারের সাথে সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এল.টি.সি. ঃ

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ বছর অন্তর দেশের মধ্যে বা বাইরে এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা যথার্থ নয়। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রতি ৪ বছর অন্তর ভ্রমণের যে সুযোগ বিদ্যমান রাজ্যের ক্ষেত্রেও চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিভিন্ন অগ্রিম বিষয়ে ঃ

চাকরিজীবনে যে যে অগ্রিম পাওয়ার সুযোগ আছে তা বজায় রেখে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যে হারে অনুমোদন করা হবে, রাজ্যের ক্ষেত্রেও তা কার্যকরী করতে হবে।

অস্থায়ী/চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের বিষয়ে ঃ

স্থায়ী ও নিয়মিত কাজে অস্থায়ী, অনিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে না, এটা শুধু কর্মচারী সমাজের দাবি নয়। নীতিগতভাবে প্রচলিত আইন ও দেশের বিচার ব্যবস্থা স্থায়ী ও নিয়মিত কাজে অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের বিপক্ষে। সেইমত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রস্তাবমতো রাজ্যেও অস্থায়ী / এজেন্সি চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের ১০ বছর একই পদে চাকরি করলে তাদের স্থায়ী হিসাবে ঘোষণার জন্য বিচার্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। ১০ বছরের কম চাকরি হলে বিধিবদ্ধ সুবিধাসহ সমমর্যাদা প্রদানের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সুপারিশের উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে অসংগঠিত কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা করার দাবি উত্থাপিত হয়েছে। একে বিচার্য বিষয়ের মধ্যে রেখেই সুপারিশ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

পেনশন বিষয়ে প্রস্তাবনা ঃ

কর্মরত কর্মচারীদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই ভাবে ৩.৭১ ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ১.১.২০১৪ থেকে সর্বশেষ বেতনের ৬০ শতাংশ পেনশন নির্ধারণের দাবি রাখা হয়েছে।

৩১.১২.১৩- পূর্ববর্তী কর্মচারীরা যাতে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য কোন বেতনক্রমের পরিবর্তী বেতনক্রম নয়, যে পদ থেকে অবসর নেওয়া হয়েছে সেই পদের পরিবর্তিত বেতনক্রমে বেতন নির্ধারণে করে বর্তমান পেনশন নির্ণয় করতে হবে।

ন্যূনতম পেনশন ঃ

সর্বনিম্ন বেতনের ৬০ শতাংশ হিসাবে ন্যূনতম পেশন ১৪.৭০০ টাকা। পারিবারিক পেনশন ৩০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ এবং বর্ধিত হারে পারিবারিক পেনশন ৭ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১০ বছর করার দাবি করা হয়েছে।

গ্র্যাচুইটি ও কম্যুটেশন ঃ

সপ্তম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দাবিকে গ্রহণ করে সর্বাধিক গ্র্যাচুইটির পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা করার সুপারিশ করেছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও গ্র্যাচুইটি সমপরিমাণ করার দাবি করা হয়েছে একইসাথে। মৃত কর্মচারীদের চাকরির সময়কালের উপর দুটি ভাগে ৫-১১ বছরের কম চাকরিতে ১২ মাসের এবং ১১-২০ বছরের কম চাকরিতে ২০ মাসের বেতন গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের মাপকাঠি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পেনশন ঃ

৬৫ বছর বয়সে শেষ বেতনের ৭০ শতাংশ থেকে শুরু করে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শেষ বেতনের ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে। ৯০ বছর বয়সে শেষ বেতনের শতকরা শতভাগ পেনশন প্রাপ্তির সুযোগ দিতে হবে।

অর্জিত ছুটি ৩০০ (+১৫) দিন থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫০ (+১৫) দিন জমানো এবং অবসরের সময়ে ৪৫০ দিনের অর্জিত ছুটির অর্ধেক কোনও জরুরী সঙ্কটমূলক পরিস্থিতিতে অবসরের পূর্বেই নগদে রূপান্তর করার দাবি জানিয়ে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন কমিশন চূড়ান্ত অনুমোদনের পরবর্তীতে প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্টারি স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে এই উপলব্ধি থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্মারকলিপি প্রদান—এখানেই দায়িত্ব শেষ নয়। রাজ্যের কর্মচারীদের স্বার্থে, না উদার অর্থনীতির প্রয়োগে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হবে সেটাই দেখার। তবে লড়াই আন্দোলন ব্যতিত কখনোই তা শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে রূপায়ন করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টিও এর সাথে যুক্ত। অভিজ্ঞতা বলছে, ইতিপূর্বে রাজ্যে যতগুলি বেতন কমিশন গঠন ও রূপায়ন হয়েছে তার পেছনে ছিল তৎকালীন শাসক রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। ২০১১ সালে রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কর্মচারী স্বার্থের পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই, অর্জিত অধিকার রক্ষা এবং ন্যায্য পাওনা অর্জনের জন্য রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন জরুরী। বর্তমান সংগ্রাম—আন্দোলনের লক্ষ্য রাজ্যে গণতন্ত্র পুন: প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দাবি আদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। সেই দায়িত্ব পালনে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। *(স্মারকলিপির পূর্ণাঙ্গ রূপ পুস্তক আকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। মূল্য-১০টাকা)।* □

সমিতি সম্মেলন

সমিতি সম্মেলন সমিতি সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ড্রাইভার্স ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলন ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বর্ধমান জেলার কর্মচারী ভবনে কমঃ প্রবীর সেনগুপ্ত নগর ও কমঃ অমর মজুমদার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমেই তিন শতাধিক কর্মচারীর মিছিল শহর পরিক্রমা করে। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি সুধাংশু সাহা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশীষ মিত্র সম্মেলন উদ্বোধন করেন। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে প্রণব আইচ অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক গুরুপদ সরকার, আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ হরিপদ দাস এবং খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক বিকাশ রায়। ২০টি জেলার ১৩১জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২৮জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামকে অভিমুখ করে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক অর্জুন মান্না। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, আয় ও ব্যয়ের হিসাব এবং খসড়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৫৩৪৮ টাকার পুস্তক বিক্রয় হয়েছে। আগামী কার্যকালের জন্য **সভাপতি**-ছিত্বেশ্বর সিং, **সাধারণ সম্পাদক**- অর্জুন মান্না, **যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়**- গুরুপদ সরকার ও উৎপল রাজবংশী, **কোষাধ্যক্ষ**- হরিপদ দাস, **দপ্তর সম্পাদক**- উদয় মল্লিককে নিয়ে ১৪ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও ৫১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

□ □ □

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের সচিবালয়সহ লোকসেবা আয়োগ ও বিধানসভা সচিবালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন **পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের** ৪৫তম (নবপর্যায়) দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০১৬, কমরেড সুশীল দাস নগর ও কমরেড অমল ঘোষরায় মঞ্চে (কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হল, কলকাতা) সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩০ জানুয়ারি, ২০১৬ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

দুই শতাধিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয় ও ব্যয়ের হিসাব, প্রস্তাবাবলী ও সংগঠনের নিয়মাবলীর সংশোধনী সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি পেশ করেন যথাক্রমে সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ পাল, কোষাধ্যক্ষ আইনুল কাজী, অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক প্রণব কর এবং সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস।

সম্মেলনে পেশকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর ৬ জন মহিলাসহ মোট ২৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয় প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর প্রাক্তন সম্পাদক অশোক চক্রবর্তী।

সম্মেলনে উত্থাপিত প্রতিনিধিদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমগ্র বিষয়াবলী নিয়ে জবাবী বক্তব্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস।

সম্মেলনে নীতি সংবলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির নেতৃত্ব এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী।

সম্মেলন উপলক্ষে বুক স্টলের আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনের আগের দিন অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারি ছুটির পরে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলের ছোট ঘরে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ। দুই দিনে প্রায় ১৫০০ টাকার বই বিক্রি হয়।

সম্মেলন মঞ্চে উত্তরবঙ্গের চা বাগানের অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিক পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপনের উদ্দেশে সমিতির বিদায়ী সভাপতি অশোক ঘোষ ও বিদায়ী সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তুষার রায় উভয়েই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে সম্মেলনের উদ্বোধকের হাতে প্রদান করেন।

সম্মেলন থেকে নিম্নলিখিত পদাধিকারীগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন ঃ **সভাপতি ঃ** সুচেতা সাহা, **সাধারণ সম্পাদক ঃ** সুদীপ পাল, **যুগ্ম-সম্পাদক ঃ** প্রণব কর, **দপ্তর সম্পাদক ঃ** প্রতীক কুমার রায়চৌধুরী, **কোষাধ্যক্ষ ঃ** শান্তায়ন ঘোষ।

দু-দিন ব্যাপী এই সম্মেলন পরিচালনা করেন অশোক ঘোষ, আর্সেনিউস লাকড়া, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও তপন দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সামগ্রিকভাবে এই সম্মেলন সাম্প্রদায়িকতা ও নয়া উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে ও রাজ্যের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য, স্বৈরাচারী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং দম বন্ধ করা পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম-আন্দোলন জারী রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে।

□□□

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ৩৩তম রাজ্য সম্মেলন বিগত ৫-৬ মার্চ, ২০১৬ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪ মার্চ, ২০১৬ বুক স্টলের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ দীপক নাগ।

৫ মার্চ, ২০১৬ এক বর্ণাঢ্য মিছিল বারুইপুর শহরে সংক্ষিপ্ত পথ পরিক্রমা করে। ১৬টি জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ সহ ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। সম্মেলনের রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি নির্মল দাস। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতিসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ উচ্চারণ শাখা, বারুইপুর শাখা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র তার উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনকে উদ্দীপ্ত করেন।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডঃ হরপ্রসাদ সমাদ্দার, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজ স্বাগত ভাষণ দেন। এরপর ১২ই জুলাই কমিটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক সুযশ চক্রবর্তী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতেই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর চক্রবর্তী। সমিতির কোষাধ্যক্ষ নারায়ণ মিশ্র আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। এছাড়াও ১২টি প্রস্তাব একত্রে পেশ করেন সমিতির অন্যতম সংগঠন সম্পাদক মিহির জানা। সমর্থন করেন যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর চক্রবর্তী। পরবর্তীতে সম্মেলন মঞ্চে বিশেষ ৪টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবগুলি হল—(ক) ধর্মঘট ও অর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার স্বার্থে—উত্থাপক অসিতবরণ দাস, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন নব্যেন্দু ভট্টাচার্য। (খ) মিথ্যা মামলা, নীতিহীন হয়রানিমূলক বদলী ও প্রশাসনের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে— উত্থাপন করেন তাপস কুমার সাহা, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন গৌরাঙ্গ পণ্ডিত। (গ) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার দাবিতে—উত্থাপক কমলা দে, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শিখা চৌধুরী। (ঘ) চা বাগান শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে—উত্থাপক নাথুন ব্যাটার্জী, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অমিত বোস। সম্মেলনে মোট ১৪২ জন প্রতিনিধির (৪ জন মহিলাসহ) মধ্যে প্রতিবেদন নিয়ে ৩২জন বক্তব্য রেখেছেন।

৬ মার্চ মূলতুবি অধিবেশনের শুরুতে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক মানস মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। খসড়া প্রস্তাবাবলীর সম্পর্কে জবাবী ভাষণ দেন মিহির জানা এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাবের উপর জবাবী ভাষণ দেন কোষাধ্যক্ষ নারায়ণ মিশ্র। অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক তাপস বসু সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষ পর্বে সমস্ত আলোচনাকে ধরে জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার দাস। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সংগ্রামের শপথের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় সমিতির ৫৫ জনের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি।

সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নির্মল দাস-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সম্মেলন।

নির্বাচিত পদাধিকারীদের অন্যতম হলেন—**সভাপতি**—অমিত বোস, **সাধারণ সম্পাদক**—অশোক কুমার দাস, **যুগ্ম সম্পাদক**—প্রবীর চক্রবর্তী ও নব্যেন্দু ভট্টাচার্য, **কোষাধ্যক্ষ**—নারায়ণ মিশ্র।

□ □ □

ফায়ার সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন গত ৫-৬ মার্চ ২০১৬ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত শহরে 'কর্মচারী ভবনে' উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন পরিচালনা করার জন্য অরুণ চক্রবর্তী, শ্রীকৃষ্ণ পান্ডা ও দেবব্রত গোস্বামীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠন করা হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, খসড়া প্রস্তাবাবলী, আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন যথাক্রমে বিপ্লব সেনগুপ্ত, রাজা ভট্টাচার্য এবং অমল হালদার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, খসড়া প্রস্তাবাবলী, আয়-ব্যয়ের হিসাবকে সমর্থন করে সম্মেলনে ১৭ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধিদের বক্তব্যের উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। খসড়া প্রস্তাবাবলী সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অরুণ চক্রবর্তী। সম্মেলন মঞ্চ থেকে নব-নির্বাচিত ২৩ জন সম্পাদকমণ্ডলী সহ ৫৮ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। নব-নির্বাচিত কয়েকজন পদাধিকারী নিম্নরূপ—

সভাপতি— অরুণ চক্রবর্তী, **সাধারণ সম্পাদক**— বিপ্লব সেনগুপ্ত, **যুগ্ম সম্পাদক ও পত্রিকা সম্পাদক**—জয়ন্ত সরকার, **যুগ্ম সম্পাদক**— সরোজ বাগ, **কোষাধ্যক্ষ**— অমল হালদার।

□ □ □

গত ৩০/১/১৬ তারিখে **পশ্চিমবঙ্গ সিনিয়র অ্যাকাউন্টস ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের** দ্বাদশ দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন কলকাতায় সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রভঞ্জন ঘোষ, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সম্পাদক সুমিত বোস। সম্মেলনে ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন ২ জন মহিলা সমেত মোট ১২ জন। সম্মেলনে মোট ৪ জন মহিলা সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে সুবীর সেনগুপ্ত সভাপতি নির্বাচিত হন।

এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভা থেকে নিম্ন বর্ণিত পদাধিকারীরা নির্বাচিত হন।

সাধারণ সম্পাদক - সুব্রত বণিক, **যুগ্ম-সম্পাদক**- শৈবাল ভট্টাচার্য, **দপ্তর সম্পাদক**- মানিক রঞ্জন সাহা, **কোষাধ্যক্ষ**- দেবাশীস দত্ত। □

পুস্তক পর্যালোচনা

বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়েছেন, অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি পাঠ করেননি এমন কাউকে এই বাংলায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই কবিতাটিতে ভয়াবহ সামন্ততান্ত্রিক শোষনের ছবি তুলে ধরেছেন বিশ্বকবি।

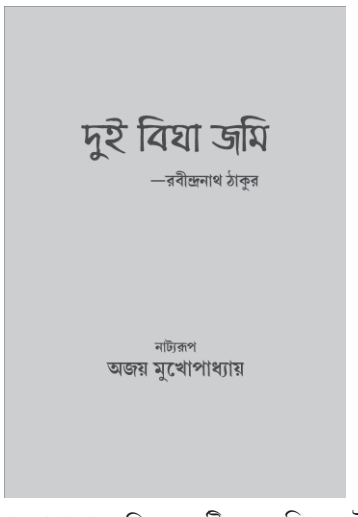

কবিতাটি কবি রচনা করেন ১৩২০ সালের ৩১ জৈষ্ঠ্য, ইংরেজির ১৮৯৫ সালে। কবিতাটি তাঁর 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এবং পটভূমি তৎকালিন পূর্ববঙ্গ।

এই কবিতাটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব অজয় মুখোপাধ্যায়। আজ নয়, বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের খড়দহ শাখা নাটকটি বহুবার মঞ্চস্থ করে। প্রশংসিতও হয়। সম্প্রতি এটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

অজয় মুখোপাধ্যায়ও তাঁর যৌবনে, কর্মচারী আন্দোলনে সম্পূর্ণত আত্মনিয়োগের পূর্বে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আবৃত্তিকার ও অভিনেতা হিসেবে সুনামও অর্জন করেছিলেন। স্বভাবতই কোনো একটি মর্মস্পর্শী কবিতাকে নাট্যরূপ দেয়ার তাগিদ তাঁর মধ্যে কাজ করা স্বাভাবিক। নাটকের প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি নাট্যরূপ দিতে প্ররোচিত করেছে তা বোঝা যায়। কিন্তু দুই বিঘা জমিই কেন?

এর উত্তর দিয়েছেন লেখক নিজেই। তাঁর মতে বাংলার কৃষকের হৃদয় নিংড়ানো অসহ্য ব্যথার এক অপূর্ব সুর-মুর্চ্ছনা অমর কবির দুই বিঘা জমি। আর নিজে প্রথমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে ও পরবর্তীতে কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব হিসেবে সারা বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ) চষে বেড়িয়েছেন এবং দেখেছেন— তাঁর কথায়, যখন এ রাজ্যে ভূমি সংস্কার, বর্গা অপারেশন বা পঞ্চায়েত রাজ প্রযুক্ত হয়নি, তখনকার নৃশংস কৃষক নিপীড়নের চিত্র। স্বভাবতই উপলব্ধী করেছেন শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও, কবির দেখা গ্রাম বাংলার সামন্ততান্ত্রিক শোষন চরিত্রের কোনো পরিবর্তন তখনও ঘটেনি। না, এমনকি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও না। সোনার বাংলা দু'টুকরো হয়েছে কিন্তু কৃষকের দুঃখ যন্ত্রনার অবসান হয়নি। তাই দুই বিঘা জমির প্রাসঙ্গিকতা গত শতাব্দীর পাঁচের দশকেও ছিল একই রকম।

কবিতাটিতে জমিদারের ভোগ বিলাসপূর্ণ জীবনের যে আঁচ পাওয়া যায়, তাকে নাট্যমঞ্চের চাহিদা অনুযায়ী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তৎকালীন জমিদারবর্গ সর্বদাই স্তাবক পরিবৃত হয়ে থাকতেন। জমিদারের ছুঁড়ে দেওয়া এঁটো খেয়েই যারা আহ্লাদে গদ গদ হত। তাই 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিতে কবি বলেছেন, 'বাবু যত বলে, পারিষদ সবে বলে তার শতগুণ'। এই স্তাবকদের চরিত্র নাট্যরূপ দিতে গিয়ে অজয় মুখোপাধ্যায় যথপোযুক্তভাবেই চিত্রায়িত করেছেন। এ ছাড়াও নাটকের প্রয়োজনে কয়েকটি অতিরিক্ত চরিত্রও এসেছে যাঁদের কবিতায় কোনো উল্লেখ ছিল না। তবে স্বয়ং সম্পূর্ণ নাটক হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজন ছিল। জমিদারের বৈঠকখানায় মহাত্মা গান্ধীর ছবি তৎকালীন জমিদারদের রাজনৈতিক আনুগত্যের অভিমুখ নির্দেশ করে। মোট দুটি অঙ্কে বিধৃত এই নাটকটি মঞ্চস্থ হলে পরে এখনও যেমন দর্শকদের আকর্ষণ করবে, তেমনই কোন্ বন্ধুর পথ পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, বর্তমান প্রজন্মকে তাও স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে। □ ***সুমিত ভট্টাচার্য***

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলাশাখার আহ্বানে ১২ মার্চ, ২০১৬ কর্মচারী ভবনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাপক মহিলা কর্মচারী, পরিবারের মহিলা সদস্যা ও সংগঠনের কর্মী-নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা সভার কর্মসূচীটি সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপট ও আলোচ্য বিষয়বস্তুর সূত্রায়ন করেন জেলা মহিলা সাব কমিটির সদস্যা পিয়ালী সাহা। মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যা সুতপা হাজরা। নয়া উদারনীতির ধারা সমাজের মহিলারা আক্রান্ত, রাজ্যে নারী নির্যাতন, গণতন্ত্র ধ্বংস অর্জিত অধিকারগুলি হরণ করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে মহিলাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে অত্যন্ত মনোগ্রাহি ও মূল্যবান বক্তব্য রাখেন তিনি।

সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন জেলা মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা সাধনা ঘোষ, সুপ্তি সহিস ও মীরা সেনাপতি। □

কমরেড কান্তি বিশ্বাস

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

চলে আসেন। বনগাঁয় নহাটা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহ-প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর সদস্য হন। তিনি উদ্বাস্তু আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও যুব আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে গাইঘাটা সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়ে যুব কল্যাণ দপ্তরে মন্ত্রী হন। পরবর্তীতে ১৯৮২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। কমরেড কান্তি বিশ্বাসের মৃত্যুতে বাম ও গণআন্দোলনের বৃত্তে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকেও কমরেড কান্তি বিশ্বাসের প্রয়ানে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে।□

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 12th Issue, April 2016

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য
শিক্ষাঙ্গন = শিক্ষা (মন্ত্রীর) রণাঙ্গন

অশোক রায়

শিক্ষা এবং জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় ভারতবর্ষ অনেক সাফল্য অগ্রগতি কৃতিত্বের দাবিদার। এর উৎকৃষ্ট সংস্থা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস যা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালের কংগ্রেসে দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ কয়েকজন বিজ্ঞানী পৌরাণিক কাহিনীকে বিজ্ঞান বলে চালানোর চেষ্টা করেন, এতে গোটা দেশে একটা ঝড় বয়ে যায় চিন্তাবিদদের। সেই কংগ্রেসে একদিনের জন্য যোগ দিয়েছিলেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণন। এ বছর সেই বিজ্ঞান কংগ্রেস (১০৩তম) যখন চলছে মহীশূর বিদ্যালয়ে, তখন একদিকে তিনি চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে (৫/১/১৬) বক্তৃতায় বলছেন, 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে আমি যোগ দিয়েছিলাম। দেখলাম বিজ্ঞান নিয়ে খুব সামান্য আলোচনাই হয় সেখানে। ওটা একটা সার্কাস...' 'বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতি বা ধর্মীয় ভাবাদর্শকে মিশিয়ে ফেলা একদম উচিত কাজ নয়।' আবার অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর ১০৩তম বিজ্ঞান কংগ্রেস উদ্বোধনের দিনই পাশের শহর বেঙ্গালুরুর Indian Inst. of Science-এর ক্যাম্পাসে দেশের ১০০০-এর বেশি বিজ্ঞান গবেষকরা বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন—তাদের সরকারী ভাতা বন্ধের বিরুদ্ধে। এটাই নির্মম সত্য, কিন্তু মিডিয়ায় স্থান পায়নি। কিন্তু এসব কথা বর্তমান দেশশাসক ও রাজ্য শাসকদের কানে পৌঁছোচ্ছে কিনা বোঝা দুষ্কর। ইতিমধ্যেই আরেক নোবেলজয়ী অর্মত্য সেনকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্প থেকে সরে যেতে হয়েছে, ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপাররা ইতিহাস পরিষদ থেকে বিতাড়িত। এ রাজ্যের সুনন্দ স্যান্যাল, সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতো শিক্ষাবিদরা, ব্রাত্যজনের তালিকায়। আর ক্ষমতার অলিন্দে সুগত মারজিৎ, অভিরূপ সরকার-এর মতো নয়া উদারনীতির একনিষ্ঠ সেবকরা। যে উদারনীতির মূল কথা শিক্ষা হল পণ্য, লাভজনক পণ্য, কাজেই এইক্ষেত্রে সরকারি দখল ছেড়ে দিতে হবে বেসরকারী ব্যক্তি পুঁজির হাতে। (সম্প্রতি WTO-র দোহা বৈঠকের অসমাপ্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নাইরোবীর বৈঠকে এ সম্পর্কে আলোচনায় আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সইও করেছে ভারত সরকার।) অতএব তার জন্য যা যা করার করতে হবে। চক্ষু লজ্জা, আদর্শ, ঐতিহ্য এসবের স্থান নেই। সবকিছুই অর্থমূল্যে বিক্রয়যোগ্য পণ্য। যারা সমর্থ তারাই শিক্ষা কিনবে আর যারা সামর্থ্যহীন তারা টোলে যাবে, বেসরকারী মাদ্রাসায় যাবে। পশ্চাদগামী শিক্ষা তাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে ঐসব বিকৃত রুচির মানব সন্তানদের ব্যবহার করা হবে মানব সম্পদের বিনাশ ঘটানোর কাজে। সেই মারণযজ্ঞই এখন গোটা দেশে এবং এ রাজ্যেও চলছে।

অতি সম্প্রতি ১৯ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) এবং ২০ জানুয়ারি (বুধবার) আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের ইসালামাবাদে এবং পেশোয়ারে শিক্ষায়তনের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। আমরাও এই হামলার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাই এবং সমবেদনা জানাই নিহত ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের পরিবার পরিজনকে। আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যে প্রায় একই ধরনের হামলা চলছে শিক্ষাঙ্গনে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কলেজ আশুতোষ কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ গণ্ডগোলের ভয়ে। গত ২৯ জানুয়ারি শুক্রবার কলেজের শিক্ষক-প্রতিনিধি নির্বাচনে বামপ্রার্থীরা জয়ী হওয়ায় শাসক অনুগত ছাত্র সংগঠনটি গোটা কলেজ চত্বরে ভাঙচুর চালায় শিক্ষকদের নিগ্রহ করে। প্রায় প্রতিদিন এ রাজ্যে ছাত্রীদের উপর ধর্ষণ, খুনের ঘটনা ঘটছে। গোঘাট, দিনহাটা, সিতাই ইত্যাদি যেমন মর্মন্তুদ ঘটনার সাক্ষী তেমনি এর বিপরীতে জেনকিন্স স্কুলে সাইকেল বিলিতে ছাত্রের প্রতিবাদ এবং ঐ জেলাতেই দিনহাটায় এক ছাত্রীর প্রতিবাদের মতো ঘটনা ও যাদবপুরে রাজ্যপালের হাত থেকে ডিগ্রি প্রত্যাখ্যানের মতো সাড়া জাগানো ঘটনাও ঘটছে।

দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র গৈরিকীকরণ নয় একই সাথে নামিয়ে আনা হয়েছে সামাজিক রাজনৈতিক সন্ত্রাস, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত ছাত্র পি এইচ ডি পাঠরত রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার ঘটনা এবং আমাদের রাজ্যেও এক মেডিকেল ছাত্রীর আত্মহত্যা বা রহস্য মৃত্যু, চাকরি প্রার্থীদের আত্মহত্যার চেষ্টা, অনশনরত, হতাশ মাদ্রাসার শিক্ষক নজরুল ইসলামের নমাজ সেরে আত্মহত্যার প্রয়াস—এইসব ঘটনা অভিভাবক অভিভাবিকা হিসাবে আমাদের কি স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে?

আর ইতিহাসের নির্মম চক্রবৎ পুনর্জন্ম হাস্যকরভাবে প্রতিদিন এ রাজ্যে ঘটছে। একটা ঘটনা সকলেই সংবাদপত্রে দেখেছেন যে ১৯ জানুয়ারি যেদিন ইসলামাবাদে স্কুলে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় ঐদিনই এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বোলপুর থেকে বর্ধমান যাওয়ার পথে কাঁকসার পিয়ারগঞ্জে খালি পায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যেতে দেখে কাতর হয়ে সেখান থেকেই ফোনে শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেন স্কুলের বাচ্চাদের জন্য জুতো কেনার ব্যবস্থা করতে। পরদিন অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি জরুরি মন্ত্রিসভার বৈঠকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দও করলেন। আবার ১৯ জানুয়ারি বিকেলে মাটি উৎসবে মেতে ওঠার ছবিও পরদিন সংবাদপত্রের হেডলাইন দখল করলো। কিন্তু রাজ্যের অতিথি অধ্যাপকদের রিলে অনশনের ২২ দিন পার হয়ে ১৮ জানুয়ারি ঐদিন বিকাশ ভবনে অভিযানে গেলে পুলিশের বেধড়ক লাঠি জুটল। শিক্ষামন্ত্রী নিরুত্তর। আর যেদিন মুখ্যমন্ত্রী মাটি উৎসব শুরু করেছেন ঐদিনই ১৯ জানুয়ারী, গোঘাটের ধর্ষিতা স্কুল ছাত্রীর প্রতিবাদী বাবাকে বেধড়ক পিটিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিচ্ছে, তাঁরই অনুগত ভক্তরা। কেননা তার অপরাধ যে সে থানায় গিয়েছিল তার মেয়ের উপর অত্যাচারের ঘটনা নথীভুক্ত (FIR) করার জন্য।

২০ জানুয়ারি সংবাদপত্রে আরও একটি সংবাদ নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন ঐদিন 'এইসময়' পত্রিকা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এ রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে নেটের মাধ্যমে পর্ণ ছবি দেখছেন এবং কোন চ্যানেলে ঐসব ছবি পাওয়া যায় তা নিয়ে বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করেছে—যা আরও ভয়ঙ্কর দিকের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই নিয়ে চরম দুর্ভোগ এই সময়েই চলছে। পর্ষদ এবং সরকারের বক্তব্যের গড়মিল, হয়রানি ইত্যাদির খবরের মধ্যেই এই প্রতিবেদন।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় যা পূর্বে বেথুন ট্রেনিং কলেজ তাকেই ১৫০টা কলেজের ভার দেওয়া হয়েছে বি এড করানোর জন্য। কার্যত কোনো পরিকাঠামো ছাড়াই। কাজেই ট্রেনিং পেতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের অবস্থা ভয়ঙ্কর অন্ধকারে। আর তার সাথে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে খোদ শিক্ষামন্ত্রীই প্রকাশ্যেই জানাচ্ছেন 'যারা টাকা নিয়েছেন ফেরত দিন'। অবশ্য ভুক্তভোগীরা জানেন রাজ্যের সারদা কেলেঙ্কারীর পর সেই অমৃত বানী'—'যা গেছে তা গেছে।' টেটের মাধ্যমে চাকরি প্রার্থীদের অভিভাবকরা কি অন্য কিছু ভাবছেন বা অন্য কিছু ভাবা সম্ভব কি? খবরেই প্রকাশ ২ থেকে ৪ লক্ষ করে প্রার্থী পিছু টাকা শাসকের ডান বা বাঁ হাতের হাতে তুলে দিয়েছেন কয়েক লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর অভিভাবক—তারাও কি ভাবছেন—'যাই হোক ২০১৬-তে এরাই জিতবে।'

সরকারী তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিজ্ঞাপনে প্রায় ৪০০ গুণ ব্যয় বৃদ্ধি করে বিজ্ঞাপন দিয়ে এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় যা বিগত ৩ বছরে তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে—সেটা একটু নেট খুলে মিলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। (আমরা বিগত সংখ্যায় নেট-এর প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছি উৎসাহী পাঠক একবার দেখে নিতে পারেন।) আর ২০১৫ সালে বিধানসভায় আইন বদল করে রাজ্য উচ্চশিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং এবং ভাইস চেয়ারম্যান (প্রশাসন) হয়েছেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব। একইভাবে আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষই আবার কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষই আবার স্কুল শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান, বাগবাজার উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের ডিন এবং সহ-উপাচার্য একই ব্যক্তি। শিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে না বলে যতই দাবি করুন আমাদের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী (যিনি শুধুমাত্র মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরে বসে থিসিস সাবমিট করে ডক্টরেট হয়েছেন) রাজ্যের শিক্ষিত বা শিক্ষা পেতে ইচ্ছুক মানুষও কি সে দাবির সাথে সহমত? জবাব মিলবে ২০১৬-তেই।

একটা পুরোনো প্রচলিত প্রবাদ দিয়েই বর্তমান নিবন্ধের ইতি টানব যে, 'পাপ বাপকে ছাড়ে না'। এই প্রবাদটাও মিলে যাচ্ছে বর্তমানে শুধু পুলিশ কর্মীরাই নয়, যারা দলদাসত্বে ইন্ধন জুগিয়েছেন তারা সেই দলেরই উঠতি শক্তির হাতে প্রহৃত হচ্ছেন কিন্তু মামলা বা অন্য কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারছেন না, প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে নিহত জওয়ানের তদন্তে সেনাবাহিনীর নজরদারীতে কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলেও তাদের করুণ অবস্থা সংবাদের শিরোনামেই আছে। একই অবস্থা সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদেরও ইতিমধ্যেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এলাহাবাদ চলে গেছেন। সম্প্রতি গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় এক পিকনিক পার্টিতে স্থানীয় কাউন্সিলর (অবশ্যই শাসক দলের)-এর চড় খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরেই দিন খবরের কাগজে সে ছবিও প্রকাশিত হয়। ঐ অধ্যক্ষ মহাশয় থানায় অভিযোগও জানিয়েছিলেন যদিও পরে তা তুলে নেন। এই অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরিচয় হচ্ছে তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিতও হয়েছিল, অধ্যক্ষের ছাত্র পেটানোর সংবাদ শিরোনামে যে, 'তৃণমূল করি, কেউ আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।' ইতিহাসের এই করুণ অথচ সত্য প্রকাশের প্রেক্ষিতে বলতেই হবে মাস্টার মশাই এবার একটু সাবধান হোন—সমাজ আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেটা একটু খেয়ালে রাখুন না হলে পুরোনো প্রবাদকে স্মরণ করুন। ২০১৬-তে নতুন করে ভাবুন—কি করা উচিত?

গোটা দেশে ঝড় বইছে জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়াকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ দিল্লী পুলিশের গ্রেপ্তারের ঘটনায়। অভিযোগ দেশদ্রোহীতার।

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ পাতিয়ালা কোর্টে তোলার সময় তার উপর চড়াও হয় গেরুয়া আইনজীবীদের একাংশ বিক্রম চৌহানের নেতৃত্বে, সাংবাদিকরাও বাদ যায়নি। পুলিশ কমিশনার এস এস বাসুজি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করলেন। এর আগে বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপি এম এল এ-কে ছাত্রের উপর চড়াও হওয়ার দৃশ্য মিডিয়ার কল্যাণে সকলেই দেখেছেন।

অথচ এতবড় একটা ঘটনায় এ রাজ্য নিরুত্তর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। যেদিন (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬) পাতিয়ালা কোর্ট চত্বরে গেরুয়া আইনজীবীরা পরিকল্পিত হামলা চালাচ্ছে ঐদিনই তৃণমূলের নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি সাংসদ মুকুল রায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে বৈঠক করছেন। না, এটাকে কাকতালীয় হলা যাবে না। □

স্বল্প সঞ্চয়ের সুদে কোপ— কার স্বার্থে?

মানস কুমার বড়ুয়া

জনগণের, বিশেষত মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে স্বল্প সঞ্চয়ের সুদের হার অনেকখানি কমালো কেন্দ্রীয় সরকার। সুদ কমল পি পি এফ, কে ভি পি থেকে শুরু করে ডাকঘরের প্রায় সব প্রকল্পে। ফেব্রুয়ারি মাসে স্বল্পসঞ্চয়ের সুদ ছাঁটাইয়ের যখন ইঙ্গিত দেয় কেন্দ্রীয় সরকার—তখন বলা হয়েছিল, এর আওতায় রাখা হবে না শিশুকন্যা ও প্রবীণদের প্রকল্পগুলিকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত রেয়াত করা হয়নি সেগুলিকেও। শিশু কন্যাদের জন্য চালু সুকন্যা সমৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক প্রকল্প, এমনকি পাঁচ বছরের মাসিক আয় প্রকল্পের সুদের উপরও কোপ পড়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ সারণী)

এদেশে উদারনীতির চরম রমরমার যুগে স্বল্পসঞ্চয়ে সুদের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করাটাই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এবারের মতো ব্যাপকহারে হ্রাস অতীতে কখনও হয়নি (সর্বোচ্চ ১.৩ শতাংশ)। সুদের হার হ্রাসের সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে 'মার্কেটের রিটার্নে'র উপর নির্ভর করে প্রতি তিন মাস অন্তর সুদের হার পুনর্নিধারণ করা হবে। অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি আবার সুদ হ্রাসের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

আসলে সবই হচ্ছে উদারনীতির শর্ত মেনে। উদাহরণ হিসেবে ডাকঘরের জনপ্রিয় এম আই এস (মান্থলি ইনকাম স্কীম)-এর কথা ধরা যেতে পারে। এটি চালু হয় ১৯৮৭ সালে। তখন সুদ পাওয়া যেত বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে। যা মাসিক কিস্তিতে দেওয়া হতো। ছয় বছর শেষে আসল এবং তার সাথে আসলের ১০ শতাংশ বোনাস যোগ করে ফেরত পাওয়া যেত। ১৯৯১ সালে উদারনীতি চালু হবার পর ১৯৯২-তে সুদ বাড়িয়ে করা হয় ১৪ শতাংশ। কিন্তু পরবর্তীকালে সুদের হার কমতে কমতে ৮.৪ শতাংশ হয়েছে। এবারে আরও কমে হবে ৭.৮ শতাংশ। তুলে নেওয়া হয়েছে ১০ শতাংশ বোনাস। এক লক্ষ পাঁচ শত টাকা মাসিক আয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে প্রতি মাসে এখন পাওয়া যায় ৭০৪ টাকা, ১ এপ্রিল থেকে নতুন হার কার্যকর হলে তা কমে হবে ৬৫৩ টাকা। আবার আমানতকারীদের প্রাপ্ত সুদের হার কমিয়ে ক্ষান্ত হয়নি কেন্দ্রীয় সরকার, ব্যাপক হারে কমানো হয়েছে এজেন্টদের কমিশনও। শ্যামলা-গোপীনাথ কমিটির সুপারিশ মেনে প্রায় সব প্রকল্পেই কমিশন অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। পি পি এফ (পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড) এবং সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কীমে কমিশন তুলে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টই বলেছে স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত আসলে সংস্কারেরই অঙ্গ। আর্থিক শ্লথ গতিকে পরিবর্তন করতেই নাকি এই সুদ কমানো হয়েছে প্রতি ক্ষেত্রেই আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির যুক্তিকে সামনে আনা হয়েছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সরকার তার ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে নি। আসলে সাধারণ মানুষকে নিশ্চিত সুরক্ষিত রোজগারের পরিবর্তে ফাটকা কারবার ও বাজারের ওঠা-নামার অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে চায় উদার অর্থনীতি। তাই তো ১৯ মার্চ যেদিন স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ কমানোর সরকারী ঘোষণা করা হয় সেদিনই শেয়ার বাজার সবচেয়ে তেজী হয়ে ওঠে। সেনসেক্স বেড়ে যায় ৩২৩ পয়েন্টে।

স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ ছাঁটাই-এর সিদ্ধান্ত দেশের বৃহৎ শিল্পপতিদের স্বার্থে। উদারনীতির কারবারীদের যুক্তি স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ কমলে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ব্যাঙ্কের সুদ কমবে। এর ফলে শিল্পপতিরা কম সুদে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারবে। যার দ্বারা আর্থিক বিকাশ হবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। এই যুক্তির কোনো সারবত্তা নেই। একই যুক্তিতে গত বছরের বাজেটে কর্পোরেটদের সম্পত্তিকর পাঁচ বছরের জন্য ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছিল। তারপরেও কিন্তু চলতি আর্থিকবর্ষে কর্মসংস্থানের হার ঋণাত্মক।

স্বল্প সঞ্চয়ের উপর আঘাতের অর্থই হচ্ছে আমজনতার উপরে আঘাত। বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের উপর তীব্র আঘাত। উদার আর্থিক নীতির ফলস্বরূপ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে শ্রমিক-কর্মচারীদের। বামপন্থী দলগুলি এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। অদ্ভুতভাবে সাধারণ মানুষের উপর এত ভয়ঙ্কর আক্রমণের পরও নিশ্চুপ এই রাজ্যের 'মা-মাটি-মানুষের' সরকার এবং তার নেত্রী। এই জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে সকলকে অবিলম্বে পথে নামতে হবে। □

সঞ্চয় প্রকল্পের নাম	১.৪.২০১৬-র আগে সুদ ছিল	১.৪.২০১৬ থেকে ৩০.৬.২০১৬ পর্যন্ত সুদের হার
১। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড	৮.৭ শতাংশ	৮.১ শতাংশ
২। কিষাণ বিকাশ পত্র	৮.৭ শতাংশ	৭.৮ শতাংশ
৩। জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট	৮.৫ শতাংশ	৮.১ শতাংশ
৪। মাসিক আয় প্রকল্প	৮.৪ শতাংশ	৭.৮ শতাংশ
৫। প্রবীণ নাগরিকদের পাঁচ বছর মেয়াদী এমআইএস	৯.৩ শতাংশ	৮.৬ শতাংশ
৬। সুকন্যা সমৃদ্ধি আমানত	৯.২ শতাংশ	৮.৬ শতাংশ
৭। ১ বছরে টাইম ডিপোজিট	৮.৪ শতাংশ	৭.১ শতাংশ
২ বছরে টাইম ডিপোজিট	৮.৪ শতাংশ	৭.২ শতাংশ
৩ বছরে টাইম ডিপোজিট	৮.৪ শতাংশ	৭.৪ শতাংশ
৫ বছরে টাইম ডিপোজিট	৮.৫ শতাংশ	৭.৯ শতাংশ
৮। ৫ বছরে রেকারিং আমানত	৮.৪ শতাংশ	৭.৪ শতাংশ
৯। সেভিংস জমা	৪.০০ শতাংশ	৪.০০ শতাংশ

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ **www.statecoord.org**
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।